মৃণাল

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পাঁচ সিকা

পূর্ব্বকথা

মৃণাল প্রকাশিত হইল। ইহার গল্পগুলি ভারতী, প্রবাসী, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'মুক্তি' গল্পটি প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে লেখা,—অনেকে আমার সমস্ত গল্পগুলি একসঙ্গে গুচ্ছাকারে দেখিতে চান্ বলিয়া তাঁহাদের অনুরোধে সম্পূর্ণতার খাতিরে সেটিকে এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

১৭, মোহনবাগান রো,
কলিকাতা,
১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পূজনীয়া দিদি

৺সুরূপা দেবী

দিদি,

এ বইখানি যখন ছাপিতে দিই, তখন তুমি রোগ-শয্যায়। এ বইখানি দেখিবার জন্য তোমার কি আগ্রহ ছিল!

আজ এ বই ছাপা হইল, কিন্তু

স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। তাই এ মৃণালের ডোরে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে বাঁধিতে চাহিতেছি! তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি আমার এ সাধ সফল করিবে, নিশ্চয়।

স্নেহানুগত

সৌরীন্দ্র

সূচী

সাত বৎসর পরে মেশের ঘরে মিস্ত্রী লাগিয়াছিল। বাজার করিয়া ফরমাস খাটিয়া মেশের কর্ত্তার মন একটু পাইয়াছিলাম, তাই সুপারিশ আর মিনতির জোরে দক্ষিণ দিকের সিঙ্গ্‌ল্‌-সীট্‌-ওয়ালা ছোট ঘরটায় বদলি হইয়া আসিলাম। এক টাকা ভাড়া বেশী দিতে হইল। তা হোক, তবু এ ঘরে একটু হাওয়া আছে, গরমে পচিয়া মরিতে হইবে না। তা ছাড়া একটু আকাশের মুখও দেখা যাইবে। যে ঘরে ছিলাম, সে ঘরে জানলা একটা মাত্র ছিল, তার নীচেই অন্ধকার সরু গলি, ছাপ-মারা সেওয়াড ডিচ্‌। হাওয়ার নাম ত ছিলই না, মাঝে মাঝে গুম্‌সুনি ঝাঁজের সঙ্গে এমন একটা ভ্যাপসানি গন্ধ উঠিত যে নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম করিত।

বাজার করিয়া আসিয়া নূতন ঘরে বিছানা-পত্র পাতিয়া বসিয়া ছিলাম। সেদিন রবিবার। কোন তাড়া ছিল না। কাগজ-পত্র বাহির করিয়া বাড়ীতে চিঠি লিখিতেছিলাম। স্ত্রীর অসুখ, ছোট ছেলেটাও মাসখানেক ভুগিতেছে, তাহার জন্য একটিন বার্লি আর কিছু বিস্কুট কিনিয়া পাঠাইতে হইবে। একবার বাড়ী যাইতে পারিলে ভাল হইত! কিন্তু পয়সায় কুলায় না। সেবারে বাড়ী গিয়া দুই দিন থাকিয়া আসিয়াছি। বাড়ী যাওয়ার মানে যাতায়াতে প্রায় তিন টাকার উপর ট্রেণ ভাড়া লাগে। তাই, মনে করিলেই যাওয়া চলে না। পূর্ব্বে মাসে একবার করিয়া যাওয়া ঘটিত; এখন চারটি ছেলে-মেয়ে ডাগর হইয়া উঠিয়াছে, সংসারে খরচ বাড়িয়াছে—ঘন-ঘন গেলে অনর্থক কতকগুলা পয়সা খরচ হয়, তাই তেমন যাওয়া চলে না।

স্ত্রী অনুযোগ করিয়াছিল, একবার গিয়া বাড়ীর হাল দেখিয়া আসিলে হয়! তাই বুঝাইয়া আশ্বাস দিয়া এক লম্বা চিঠি ফাঁদিয়া বসিয়াছিলাম। কেরাণী-জীবনের দুঃখ যে কি, বিশেষ মার্চ্চেণ্ট অফিসের সামান্য কেরাণীর জীবন—তাহাই বুঝাইতেছিলাম,—হঠাৎ নীচে পাশের বাড়ী হইতে কতকগুলা কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল। বালিকা-কণ্ঠে একটা ধ্বনি উঠিল,—এই স্থাখো'সে মা, তোমার আদরের বৌ কল্‌তলায় পড়ে দাদার সেই ভালো চায়ের বাটিটা ভেঙ্গে ফেলেছেন!

অমনি সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে তীব্র ভৎর্সনা জাগিল—এঁ্যা! এমন বেয়াক্কেলে বাপের মেয়েও ত দেখিনি কোনকালে, বাবা! হাড় জ্বালিয়ে খেলে! ধিঙ্গি মাগী! কল্‌তলায় পড়্‌লো কি বলে, বল দিকি! এ খালি হিংসে বৈ ত না! চায়ের বাসন নিত্যি ধোওয়া-মাজা,—ভাঙ্গ্‌ একটা—তাহলে আর ধুতে বলবে না! তা হচ্ছে না বাবা। এই বাটি ভাঙ্গার খেসারৎ তুলবো এবেলার খাবার থেকে! মনে করেচ, পার পেয়ে যাবে, ভেল্‌কি দেখিয়ে! আমার কাছে সে ফাঁকি চলচে না! আসুক নন্দ আজ বাড়ী। তার আদরের বৌয়ের কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখুক একবার! মা বড় মন্দ! মিছি-মিছি বৌয়ের পেছনে লাগে, না? আমি যাই বাপের বেটী, তাই এই বৌ নিয়ে ঘর করচি, নৈলে এ অসৈরণ কে সয়, একবার দেখি!

চিঠি লেখা বন্ধ হইল। খোলা জানলার মধ্য দিয়া পাশের বাড়ীর দিকে উঁকি মারিলাম। তক্তাপোষে বসিয়া কিছু দেখা গেল না। উঠিব কি না, ভাবিতেছি, এমন সময়, সেই কর্কশ কণ্ঠে আবার ঝঙ্কার উঠিল,—চং করে আর কতক্ষণ

পড়ে থাকবে গো! ওমা, এ কি আবার! মূচ্ছো গেলেন না কি রাজনন্দিনী!

তার পরেই একটি মিষ্ট কণ্ঠে করুণ স্বর জাগিল,—আহা, ঠোঁট কেটে রক্তে রক্ত হয়ে গেছে মা, তা দেখেচ?

এ স্বর কোন কিশোরীর! সংসারের ব্যথায় বেদনায় ক্লিষ্ট ব্যথিত স্বর! বড় মিঠা লাগিল।

অমনি আবার সেই ঝঙ্কার,—দেখো, ডাক্তার-বদ্যি চাই না কি! নাহলে ওঠা হবে না? বাঁদী-বান্দা এসে পাখা চুলোবে, তবে রাজনন্দিনীর মূচ্ছো ভাঙ্গবে! আঃ, আর পারিও না বাবা, তিতি-বিরক্তি ধরে গেছে আমার। ওঠো না গো রাজার কন্মে!

সেই কিশোরীর স্বর তখন কর্কশ ঝঙ্কারের উপর মিহি তুলি বুলাইয়া দিল,—ওঠো ত বৌ, দেখি। আহা, এসো ভাই, আমি ধুইয়ে দি। দেখ দেখি মা, কি রকম কেটে গেছে! যে তোমার কলতলায় পেছল—

মার কণ্ঠে আবার কাঁশব বাজিল—দেখতে হয় তুই দেখ্‌গে। অত আদর আমার দ্বারা পোষাবে না। ভালো আপদ! দামী বাটিটা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেল্‌লে! নন্দর আমার কত সাধের বাটি! কিছু রাখেনি! ভাঙ্গবারও তারিফ আছে!

কিশোরী বলিল,—মানুষটা কেটে রক্তারক্তি হলো, তাতে একটা আহা নেই, তুমি এক বাটির শোকে পাগল হলে মা! ও কি ইচ্ছে করে ভেঙ্গেচে? ও সব থাক্ ভাই বৌ, তোমায় মাজতে হবে না। আমি সব মেজে ধুয়ে দিচ্ছি।

অমনি খুব চাপা গলায় মৃদু আর্তনাদের মত একটি ক্ষীণ স্বর ফুটিল—না ভাই ঠাকুরঝি, আমিই মাজ্‌ছি।

—না, না, না—ভারী রাগ করব আমি। তুমি সরে দাঁড়াও, আমায় মাজাতে না দিলে আমি ভারী রাগ করব কিন্তু।

এই বিচিত্র স্বরের দেওয়ালিতে কয়েকটি মূর্ত্তিও আমার চোখের সাম্‌নে নিমেষে জাগিয়া উঠিল। কাংস্য-কণ্ঠী এক স্থূলদেহী গৃহিণী, পাশে তার এক আহ্লাদী মেয়ে, প্রকাণ্ড উঁচু ঢিপি কপালের উপর চুলগুলা টানিয়া বাঁধা,—ওদিকে কলতলায় ময়লা ছেঁড়া শাড়ী পরা কুণ্ঠিতা ভীতা বৌ, আর তাহার হাত ধরিয়া দেবীর মত সান্ত্বনাময়ী কিশোরী মূর্ত্তি! কথাগুলার ফাঁকে ফাঁকে এমন একটি করুণ নাট্য জাগিয়া উঠিল যে আমার মন নিতান্ত ব্যথা-হত হইয়া এই বিচিত্র স্বরেব মালিকদের দেখিবার জন্য অধৈর্য্যে ভরিয়া উঠিল।

তক্তাপোষ ছাড়িয়া জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পাশের বাড়ীর উঠানের একটুখানি দেখা যাইতেছিল। কয়েকটা শাড়ীর প্রান্ত-মাত্র চোখে পড়িল! আর কিছুই না। তারপর আরো কয়টা ঝঙ্কার আর মিনতির সুর তুলিয়া স্বরগুলা স্তব্ধ হইল।

চিঠি সারিয়া স্নান করিতে গেলাম। মনটা কিন্তু ঐ পাশের বাড়ীর উঠানের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্নান সারিয়া ঘরে আসিয়া মাথায় চিরুণী ছোঁয়াইয়াছি, আবার সেই কর্কশ কণ্ঠ বাজিল,—ঐ দেখ্‌গে নন্দ, তোর সাধের সে চায়ের বাটি আদুরী বৌ ভেঙ্গে একেবারে খান্ খান্ করেছে!

ছেলে নন্দ তীব্র ঝাঁজে বলিয়া উঠিল,—ভেঙ্গেছে! আঃ, রোজ রোজ আর পারিও না, বাপু! কি করে ভাঙ্গলে?

মার স্বরে কাঁশর বাজিল—ঢং, গো ঢং! রাজনন্দিনীর কি ও সব ধোয়া মাজা পোষায়! তাই ভাঙ্গলে—যে, আর মাজ্‌তে

বলবে না! আর কেনই বা মাজতে যাওয়া, তা বুঝি না। আমার কি গতরে পোকা ধরেচে, না, আমি মরেচি! আমি দাসী-বাঁদী আছি ত, সব করচি যখন, তখন ওটাও নয় ধুতুম!

সেই মিহি সুর তখন বীণার মত বাজিয়া উঠিল,—ও কথা বলোনা মা।···না দাদা, বৌ পড়ে ঠোঁট কেটেছে, বাটিটাও তাই ভেঙ্গে গেছে। তোমাদের কলতলায় যে পেছল বাবু! দৈবাৎ ভেঙ্গে গেছে। ও কি ইচ্ছে করে ভেঙ্গেচে! কথা ত্যাগো না! বাটি ভাঙ্গতে ও একেবারে চোরের অধম হয়ে আছে গো, বেচারী মরে আছে যেন! আর সেই মরার উপর মার খাঁড়া সমানে চলেছে—তুমিও এবার কোমর বাঁধবে না কি?

তার পর একমিনিট সব চুপচাপ। সুপুত্র আবার গর্জ্জন ছাড়িল,—দেখি সে ভাঙ্গা বাটি!—ভেঙ্গেচে, দেখ! এর একটার দাম দশ আনা! তিন দিনও হয় নি, কিনে এনেচি!

মা বলিলেন,—সর্ব্বস্ব উড়ে-পুড়ে গেল। কি বৌই এনেছিলুম, বাবা! ছি ছি!

—মা—

এ আবার সেই দেবীর কণ্ঠস্বর! দেবীর কণ্ঠের সুরে যেন আগুন ছুটিল।

মা বলিলেন,—তুই থাম্ বীণা, আর আস্কারা দিস্নে। শাসনের সময় শাসন করতে দে।

দেবীর নাম বীণা! নামটা সার্থক হইয়াছে! ও কণ্ঠের সুর বীণার ঝঙ্কারই বটে!

পুত্র গর্জ্জন করিল,—এক বেলা খাওয়া বন্ধ কর। মার-ধর ত করতে পারি না, ভদ্দরলোকের ঘরে—

বীণা বলিল—আমারো খাওয়া সেই সঙ্গে তাহলে বন্ধ করে। দুজনের ভাত বাজারে বেচে এসোগে, তোমাদের পেয়ালার দাম উসুল হয়ে যাবে।

তারপর পাশের বাড়ীর রঙ্গভূমি চুপচাপ। আমি খাইতে গেলাম। গলা দিয়া ভাত যেন আর নামিতে চায় না। কেবলি মনে হইতেছিল,—আহা, পাশের বাড়ীর ঐ বালিকা দুটি আজ অনশনে কাটাইবে! দৈবাৎ একটা ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহারি ফলে আজ উহারা উপবাস করিয়া থাকিবে! এমনি মানুষের অন্ধ হিংসা আর স্পর্দ্ধিত অহঙ্কার! আহা, ঐ বেচারী বৌটি,—বাঙালীর ঘরের অসহায়া বালিকা! এ কি কঠোর নির্মম নির্য্যাতনের ধারা রে তোর উপর! স্নেহ-মমতার ধার কেহ ধারে না!

২

সেদিন অফিসে যাইতেছি, হঠাৎ আবার সেই কাংস্যকণ্ঠ বাজিয়া উঠিল,—ঢং গো ঢং! অসুখ! আনো বদ্যি, আনো হাকিম! তুলকালাম বাধাও খরচের।...অসুখ, —তা হবে কি? দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকুক!

বীণা বলিল,—ভয় নেই। আমি পয়সা দিয়ে সাবু আনাচ্ছি, তোমাদের খরচ করতে হবে না। আনিয়ে নিজে সাবু তৈরী করে দিচ্ছি। তোমরা গতর দুলিয়ে দশভুজা হয়ে অন্নের গ্রাস মুখে তোলো গে। ওকে না খাইয়ে আমি খাব না।

মা বলিল,—তোর আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি নে।

অসুখ? সেই বেচারী বধূটির অসুখ হইয়াছে? ঐ রাক্ষসের

পুরীতে দুরন্ত চেড়ীগুলার বাক্য-যন্ত্রণা আর সহস্র নির্য্যাতনে না জানি মুখখানি ম্লান করিয়া কি-ভাবেই সে পড়িয়া আছে! মুখে জল দিতে ভাগ্যে ঐ বীণা আছে! নহিলে কি দশাই হইত!

ইচ্ছা হইতেছিল, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনি, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় কি না! যদি না হয়, তবে নিজেই গাঁট হইতে পয়সা দিয়া কোন ডাক্তারকে উহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিই—দেখিয়া ব্যবস্থা করিয়া যাক! কিন্তু দাঁড়াইবার উপায় নাই! ঘড়িতে ওদিকে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। অফিসে লেট্ হইলে মাহিনা কাটা যাইবে! কেরাণীর আবার পরের দুঃখে দুঃখ করা সাজে কখনো!

মনের মধ্যে পাহাড়ের বোঝা বহিয়া আহারে গিয়া বসিলাম। তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া কোটটা গায়ে চড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দশটা বাজিতে তখন আর দশ মিনিট বাকী! বেলা হইয়া গিয়াছে।

যাইবার সময় পাশের বাড়ীর দিকে একবার তাকাইয়া গেলাম। বাড়ীটা দারুণ স্তব্ধতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার মনে হইল, নানা নির্যাতনে কাতর ব্যথিত বাড়ীখানা কি যেন এক অজানা ভয়ে শিহরিয়া স্তম্ভিত চিত্তে দাঁড়াইয়া আছে!

সেদিন ফিরিতে একটু রাত্রি হইল। ভোরে বড় বাবুর মেয়ের পাকা দেখা—তাঁহার সঙ্গে নিউ-মার্কেটে গিয়া কতকগুলা ফল-ফুলুরি কিনিয়া দিতে হইল। যখন ফিরিলাম, তখন চারিধার নিশীথের নিদ্রা দিয়া ঘেরা। পাশের বাড়ীরও সেই অবস্থা।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই বড় বাবুর বাড়ী ছুটিতে হইল। সেইখানেই আহার সারিয়া অফিসে রওনা হইলাম। পাশের

বাড়ীর বৌটি কেমন আছে জানিবার জন্য সারাদিন প্রাণটা অস্থির হইয়া রহিল। অফিসে কাজকর্ম্মের মধ্যেও ঐ পরিচয়-হীনা বালিকার রোগ-কাতর ম্লান ছলছল দৃষ্টিটুকু আমার আশে-পাশে বেদনার ঝড় তুলিয়া যেন ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার বেদনা ছুঁচের মত বুকে বিঁধিতেছিল।

ফিরিবার পথে দুইটি বেদানা ও কিছু আঙুর কিনিয়া লইলাম। ভাবিলাম, পাশের বাড়ীর কাহাকেও ডাকিয়া বৌটির জন্য পাঠাইয়া দিব! তবু বেচারী মুখে দিলে একটু তৃপ্তি হইবে। কিন্তু কি বলিয়া পাঠাই?

একরকম পাগলের মত ছুটিয়া বাসায় ফিরিলাম। গলির পথে তখন গ্যাস জ্বালিয়া দিয়াছে। মেশের কাছে আসিতেই সুরলয়যোগে একটা তীব্র ক্রন্দনের শব্দ কাণে আসিল,—ওগো মা গো, আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে কোথায় গেলে মা!

বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল: তবে কি—!

যা ভাবিয়াছিলাম! সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! ঠিক সন্ধ্যার সময় পাড়ার গৃহে গৃহে যখন শঙ্খরোল উঠিয়াছে, তখন সেই বেচারী বালিকা সংসারের শত অত্যাচার, শত নির্য্যাতনের পাশ কাটিয়া, সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া বাঁচিয়াছে!

মেশের সদরে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাশের বাড়ীতে গুঞ্জন-ক্রন্দনের ফাঁকে ফাঁকে সেই রাক্ষসী শাশুড়ীর তীব্র ক্রন্দন জাগিয়া উঠিতেছিল,—ওগো আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘর আঁধার করে কোথায় গেলে মা! ও বাবা নন্দ রে!

রাগে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, এখনি

ঝড়ের মত ঐ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ঐ রাক্ষসীর কণ্ঠ সবলে চাপিয়া ধরি—প্রচণ্ড প্রহারে তার ওই নিলর্জ্জ শোকাভিনয় একেবারে জন্মের মত বন্ধ করিয়া দিই !

বেদানা আঙুরগুলা দ্বারের সামনে রাখিয়া দিলাম। মরণ-পথযাত্রিণী বালিকার উদ্দেশে বলিলাম,—দেবী, তোমার দুঃখে গলিয়া তোমারই উদ্দেশে এগুলি নিবেদন করিলাম। বড় জ্বালায় জ্বলিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ ! প্রার্থনা করি, মরিয়া সুখী হও, শান্তি পাও, তৃপ্তি পাও !

উপরে আসিয়া জামাটা খুলিয়া দাড়ের আলনায় ঝুলাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম। বীণার কথা মনে হইতেছিল। বেচারী শোকে-দুঃখে অভিভূত হইয়া ঘরের কোণে কোথায় উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে ! শোকের এই বিরাট অভিনয়ের মাঝখানে কে আর তাহাকে দেখিতেছে ! ইচ্ছা হইতেছিল, তাহার শ্রান্ত বেদনাহত শির এই কোলে তুলিয়া লইয়া বলি,—কেন কাঁদছ বোন্ ? সে যে মরিয়া সব জ্বালা জুড়াইয়াছে ! এ ত তার মৃত্যু নয়, এ যে মুক্তি, মুক্তি !

কিন্তু তা বলা চলে না ! বলিবার অধিকার নাই ! আমার দুই চোখে অশ্রুর সাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল।

কতক্ষণ পড়িয়া ছিলাম, জানি না। হঠাৎ ও-বাড়ীর সেই রাক্ষসীর কণ্ঠে আবার আর্ত্ত ক্রন্দন জাগিল,—ও গো মা গো, ও আমার ঘরের লক্ষ্মী—মায়া কাটিয়ে কোথায় চললে মা ? কি দুঃখে আমাদের ছেড়ে গেলে মা ? ওগো আমার ঘরের লক্ষ্মী আজ কোথায় চল্‌লো গো !

ধড়মড়িয়া উঠিয়া নীচে আসিলাম। দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলাম,

ফুলের ভারে সজ্জিত দড়ির খাটে বাসি ফুলের মতই শুষ্ক ম্লান-মূর্ত্তি! আলতা-রাঙা পা দুখানি বাহির হইয়া আছে, সিঁথির সিঁদুর রক্তরাগে সৌভাগ্যের কি দীপ্ত মহিমাই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, যাও মা, দেবীর মহিমায় সাজিয়াই ওপারে যাও। সেখানে গিয়া ও-সিঁদুর মুছিয়া ও আলতার রঙ ধুইয়া বিশ্ববিধাতার কাছে এই শোকের ভণ্ডামির খোলস্ ছিঁড়িয়া নির্য্যাতনের নালিশ কর গিয়া। আর মিনতি জানাইয়ো, বাঙালীর ঘরে যেন বৌ করিয়া তোমার মত কচি কচি মেয়েদের তিনি আর না পাঠান্!

হরিবোল বলিয়া বাহকেরা খাট লইয়া চলিয়া গেল। নন্দ হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল। তার মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলা ঝুলিয়া মুখে পড়িয়াছে—ডাকাতের মত ভীষণ মূর্ত্তি! এই পাষণ্ডই বালিকাকে খুন করিয়াছে, আর উহার সেই দুর্দ্দান্ত মা! খুনই করিয়াছে! ইহাদের বিচার করে, এমন আদালত দুনিয়ায় নাই? আমি গিয়া হলফ লইয়া সেখানে তাহা হইলে সাক্ষ্য দিই, বলি, হাঁ, ইহারা খুনে! হাকিমকে গিয়া বলি, উহাদের ফাঁসিকাঠে লট্‌কাইয়া দাও!

কিন্তু মিথ্যা রে, মিথ্যা এ অভিযোগ, মিথ্যা এ কাতরতা! উপরে আসিয়া বিছানায় দেহ-ভার লুটাইয়া দিলাম। হঠাৎ মনে পড়িল, ঐ বালিকা বধূটির বাপ-মায়ের কথা! হয়ত এই একটিমাত্রই সন্তান তাদের! ইহাকে যোগ্য বরে যোগ্য ঘরে দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে কোথায় যে তাহারা বসিয়া আছে! জানেও না, এখানে তাহাদের কি সর্ব্বনাশই হইয়া গেল!

আমার দুই চোখে হু-হু করিয়া জল ঠেলিয়া আসিল।

ঠাকুর আসিয়া বলিল,—বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে অনেকক্ষণ।

গম্ভীর কণ্ঠে বলিলাম,—খাব না। শরীর খারাপ।

ঠাকুর চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোথা দিয়া কতকগুলা দুঃস্বপ্নের মাঝে যে কাটিয়া গেল! পরদিন ভোরে মেশের কর্ত্তাকে বলিয়া আবার সেই বায়ু-হীন পুরানো ঘরেই ফিরিয়া আসিলাম। দক্ষিণদিকের ও-ঘরে টেকা যায় না। পাশের বাড়ীর হাওয়া কেমন যেন বিষাইয়া রহিয়াছে— ও হাওয়া গায়ে না লাগে!

অপরাধী

বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। মুঙ্গেরের কলেজে পড়িতাম। বয়স তখন আঠারো কি উনিশ।

গোরাবাজারের ওদিকে ফুটবল ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ সারা আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ঝড় তুলিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। মাথা বাঁচাইবার উদ্দেশে দিগ্বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া একদিকে ছুট্ দিলাম। পিছনে ডাক শুনিলাম,—আমাদের বাড়ী আসুন, অজিত বাবু।

চাহিয়া দেখি, অশ্বিনী। আমাদেরই সহপাঠী সে, পাশের একটা বাংলার বারান্দা হইতে আমায় ডাকিতেছে। সানন্দে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সাগ্রহে তাহার বাড়ী গিয়া উঠিলাম।

অশ্বিনীরা নেটিভ ক্রীশ্চান্। বাঙালীপাড়ার বাহিরে থাকে। ছোট ফটকের মধ্যে একটু কম্পাউণ্ডও আছে, ফ্লোরের উপর ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার বাংলাখানি—ভারী পরিচ্ছন্ন। কম্পাউণ্ডে লাল নীল নানা রঙের ফুলে ভরা ছোট বাগান। ঠিক যেন একখানি ছবি!

ভিজা কাপড় বদলাইয়া মাথায় ব্রশ্ চালাইয়া ভদ্রলোক সাজিয়া ভিতরে আসিয়া বসিলাম।

অশ্বিনীর বিধবা মা আসিয়া সস্নেহে অভ্যর্থনা করিলেন। কি মধুর স্নেহ-করুণায় তাঁহার মুখখানি ঢলঢল করিতেছে—শান্ত সুন্দর শ্রীতে সমুজ্জ্বল,—যেন ম্যাডোনার মূর্ত্তি। একবার দেখিলে জীবনে সে মূর্ত্তি ভোলা যায় না! পরক্ষণেই অশ্বিনী ডাকিল,—রেবা।

টকুটকে লাল রঙের শাড়ীতে আপনার দেহখানিকে আবৃত করিয়া রাজ্যের লজ্জা গায়ে মাখিয়া এক বালিকা কক্ষে প্রবেশ করিল। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণচ্ছটায় সমস্ত আকাশ যেমন এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ বর্ণে আপনাকে রঞ্জিত করিয়া তোলে, বালিকার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি এক অপরূপ রূপের হিল্লোল! তাহার সে অপরূপ রূপের জ্যোৎস্নার প্রলয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন সেই ঘরখানি মুহূর্ত্তে অমনি চকিত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশে দোদুল বেণী, মাথার উপর টকুটকে লাল ফিতার বো-বাঁধা—সে এক অপূর্ব্ব শোভা! আমি তাহার পানে চাহিয়া চকিতে চোখ নামাইলাম।

অশ্বিনী বলিল,—ইনিই অজিত বাবু, কলেজ-টীমে খেলেন। সেদিন গোরাদের সঙ্গে কলেজের যে ম্যাচ দেখেচ, তাতে গোরারা যে গোল খেয়ে হেরে গেল—সে গোলটি ইনিই দিয়েছিলেন। এঁকে চা খাওয়াও দেখি। এঁর অভ্যর্থনার ভার তোমার উপর।

সলজ্জ মধুর ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া রেবা বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় তাহার চোখ আর ঠোঁটের কোণে যে আনন্দ-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেটুকু আমার লক্ষ্য এড়ায় নাই। আমার

মনে হইল, যেন হাসির একটা জীবন্ত বিদ্যুৎ-শিখা আমার সামনে হইতে সরিয়া গেল! এই জ্যোৎস্নাময়ী বালিকার হাতের তৈয়ারী চায়ে সেদিন অমৃতের স্বাদ পাইলাম!

অনেক রাত্রে বৃষ্টি থামিলে বাড়ী ফিরিলাম। সে রাত্রে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হইল। কেবলি রেবার সেই সুন্দর মুখ আমার প্রথম যৌবনের সমস্ত বাসনা-কামনার প্রদীপটিতে শিখার মত জাগিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। রেবা ক্রীশ্চান, ক্রীশ্চান, —এই কথাটা বার বার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ ছুরির মতঃ আমার সমস্ত আশা সমস্ত কল্পনাকে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিল!

ইহার পর হইতে অশ্বিনার সহিত ঘনিষ্ঠতা আমার খুবই বাড়িয়া উঠিল। নানা অছিলায় তাহাদের বাড়ী যাইতাম। সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে স্পোর্টিংয়ের নানা অবান্তর আলোচনায় ঘড়িতে কখন্ যে দশটা এগারোটা বাজিয়া যাইত, সেদিকে কাহারো হুঁস থাকিত না। আমি শুধু রেবার রূপ-সুধা আর তাহার হাতের তৈয়ারী চা পান করিয়া আমার সেই প্রথম যৌবনের সুদুর্লভ মুহূর্ত্ত-গুলিকে এক বিচিত্র রমণীয়তার পরিপূর্ণ বিভোর করিয়া বাড়ী ফিরিতাম।

প্রাণে তৃপ্তিই কি তেমন পাইতাম! অসহ্য বেদনা বোধ হইত, যখন বুঝিতাম, এই রেবাকে কোনদিন আমার পাইবার আশা নাই! সে ক্রীশ্চান্। এই রেবা,—কোথায় থাকিবে সে, আর কোথায়ই বা আমি! হায়রে, এখনকার এই মুহূর্ত্তগুলার সকল স্মৃতিই তখন অতীতের কোন্ অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইবে।

বেশী ভাবিতে পারিতাম না। স্বার্থের বিষে সমস্ত মন বিষাইয়া উঠিত। রাত্রে বাড়ী ফিরিবার সময় কতবার মনে করিতাম, আর না, রেবাকে আর দেখিব না! নৈরাশ্যের আগুনে এ বাসনার ইন্ধন মিথ্যা আর কেন জোগাই! রেবা পরের, রেবা সুদূরের!

কিন্তু পরদিন কলেজের ছুটি হইলেই রেবার সেই তরুণ রূপের মোহ কি প্রবল নেশায় আকুল উন্মাদ করিয়া আমায় আবার তাহারই গৃহের দ্বারে টানিয়া আনিত! ওঃ, সে কি ভীষণ মুহূর্ত্তগুলা! নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কেবলি আঘাত পাইতাম। তবুও সে আঘাত পাইবার আগ্রহে আবার সে-যুদ্ধে মাতিয়া উঠিতাম। আমি সত্যই পাগল হইয়াছিলাম।

আর পারিলাম না। একদিন ভাবিলাম, রেবাকে সব কথা খুলিয়া বলি। যদি বুঝাইতে পারি, কি তীব্র পিপাসা, কি প্রবল অনুরাগ আমার প্রাণে! হোক্ সে ক্রীশ্চান। অন্তরের এই যে প্রবল আকর্ষণ, সে কি মানুষের হাতে-গড়া এই ধর্ম্মের কৃত্রিম বেড়াটাকে ভাঙ্গিতে পারিবে না? ভাঙ্গিয়া দুইজনকে এক করিয়া দিবে না? রেবা মানুষ, আমিও মানুষ। তবে··· ?

একদিন একটা সুযোগ মিলিল। সেদিন অশ্বিনী কোথায় কি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, কলেজে আসে নাই। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কলেজের ছুটির পর তাহার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলাম। অশ্বিনীর মা বলিলেন,—রেবার বিয়ের কথা হচ্ছে। অশ্বিনী তাই ছেলেটিকে দেখতে গেছে সাহেবগঞ্জে—।

আমার বুকে যেন কে মুগুরের ঘা মারিল। রেবার বিয়ে!

অশ্বিনীর মা বলিলেন,—রেবা, চা এনে দাও। দিয়ে এখানে বসো। অশ্বিনী ত বাড়ী নেই।

তিনি চলিয়া গেলেন। রেবা চা লইয়া আসিল।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়া তখন ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। কাছেই এক সাহেবের বাঙলা হইতে পিয়ানোর ঝঙ্কারে একটা মাতাল সুর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সমস্ত বাতাসটাকেও মাতাইয়া তুলিয়াছিল। আমার প্রাণও সে সুরে মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। তার উপর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রেবা—তার তারুণ্যের অপূর্ব্ব দীপ্তি লইয়া! গোধূলির সেই মৃদু আভায় তাকে কি অপরূপই না দেখাইতেছিল!

পাগলের মত রেবার হাত ধরিয়া ডাকিলাম,—রেবা—

স্বরটা সব বাহির হইয়াছিল কি না, জানি না। সে স্বরে আমার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ অসহ্য আশঙ্কা-উদ্বেগে একেবারে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িল।

রেবা ভয়-চকিতের মত আমার পানে চাহিল। তাহার দুই চোখ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ।

আমি বলিলাম,—রেবা, আমি তোমায় ভালোবাসি, বড় ভালোবাসি। হও তুমি ক্রীশ্চান—তাতে কি বাধা? আমিও ক্রীশ্চান হতে রাজী আছি। রেবা—রেবা—

গুছাইয়া ঠিক এই কয়টা কথাই বলিয়াছিলাম কি না জানি না। তবে এই ভাবের কথাগুলাই আমার মনের মধ্যে ভাষায় ফুটিবার জন্ত আতালি-পাতালি করিতেছিল। তারপর এক-নিশ্বাসে আরো কত কথাই যে বলিয়া গেলাম!

রেবা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। আমি তার মুখের পানে সাগ্রহ পিপাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। তার রক্তিম কপোলে ক্ষণে ক্ষণে লজ্জার সুরক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিতেছিল, তার চোখের পাতা ক্ষণে ক্ষণে মুদিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া রেবা বিদ্যুৎ-শিখার মতই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারপর আমি কতক্ষণ যে মূক মৌন পুতুলের মত সেখানে ছিলাম, জানি না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজিতেছে শুনিয়া আমার যেন চেতনা হইল। আমি চোরের মত নিঃশব্দে বাহির হইলাম। ফ্লোরের নীচে একঝাড় হাসনুহানার পাশে শান-বাঁধানো ছোট চাতালটার উপর রেবা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। ওখানে রেবা কি করিতেছে? মন কৌতূহলী হইলেও পা সেদিকে গেল না। সামান্য পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পথে আসিয়া ভাবিলাম, এ কি করিলাম! মুহূর্তের দুর্বলতায়, ক্ষণিক উত্তেজনায় একটা বালিকার কাছে এমনভাবে—ছি!

দারুণ ধিক্কারে সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। রেবা কি ভাবিল? পাছে পরদিন অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা হইলে এ কথা ওঠে, সেই ভয়ে কলেজে গেলাম না। বৈকালে কষ্টহারিণী ঘাটের দিকে চলিয়া গেলাম। বাসায় ফিরিয়া শুনিলাম, অশ্বিনী কি জরুরি কাজে আমায় খুঁজিতে আসিয়াছিল। বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! তারপর দুই-তিনদিন কলেজের ছুটি ছিল—বাসা ছাড়িয়া ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম,—কয়দিনই অশ্বিনী আসিয়া দুই-তিন বার আমার খোঁজ করিয়া গিয়াছে!—কেন? কেন?

আশার দোলায় মন দুলিয়া উঠিত—আবার এক দারুণ লজ্জা

তাহাকে চাপিয়া ধরিত। এমনি জ্বালাতন হইয়া এক নিয়া পরম অছিলা তুলিয়া একদিন হঠাৎ কলিকাতায় পলাইলাম।

চট্ করিয়া ফেরা গেল না। বাড়ীতে অকস্মাৎ নানা অসুখ-বিসুখের হাঙ্গামা আসিয়া আমায় প্রায় দুই মাস বাড়ীতে আটক করিয়া রাখিল। খাঁচার পাখীর মতই পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিলাম—অশ্বিনী কেন আমার খোঁজে আসিয়াছিল? তবে কি রেবাকে পাওয়া সম্ভব! মুঙ্গেরে ছুটিয়া যাইব? একখানা চিঠি লিখিব? কি জানি, হয়ত হাতের নাগালে পাইয়াও কামনার ধনটিকে চিরদিনের জন্যই খোয়াইয়া বসিলাম!

তার পর মুঙ্গেরে ফিরিলাম, একেবারে পূজার পর, কলেজ খুলিলে। ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত সন্তর্পণে অশ্বিনীদের পাড়ার দিকে চলিলাম। ঐ যে বাড়ী দেখা যায়! সেই বাড়ী! আমার মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া নাচিয়া উঠিল। কম্পিত চরণে অগ্রসর হইলাম। এ কি, ফটকের সম্মুখে ছোট ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া এক সাহেব-বালক বেড়াইতেছে যে,—সঙ্গে এক তরুণী মেম। ফটকের সম্মুখে দেখি, কাঠের ছোট সাইনবোর্ড, তাহাতে একটা বিলাতী নাম লেখা। কে যেন আমায় নিমেষে কোন্ উচ্চ পর্ব্বত-শিখা হইতে একেবারে অতলস্পর্শ অন্ধকার গহ্বরে ঠেলিয়া দিল।

নিকটেই এক ভুট্টাওয়ালার দোকান্। সেখানে সন্ধান লইতে গিয়া দেখি, অশ্বিনীদের বাড়ীর সেই লখিয়া দাইটা এক-কোণে বসিয়া ভুট্টা সেঁকিতেছে। তার মুখে শুনিলাম, অশ্বিনী, আজ মাসখানেক হইল, বোনের বিবাহ দিবার পরই কি-একট চাকরি লইয়া রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছে—বিধবা মাও

রেবা রূপ। যাইবার সময় বাড়ীটা বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। আমি -একরকম গোলমালের মধ্যেই সারা হইয়াছে। অশ্বিনী, রেবা, কি মা—কাহারও মত ছিল না। জামাইয়ের বাপের কাছে বাড়ীটা বাঁধা ছিল --তাহারা মামলা-মকর্দ্দমা করিয়া ক্রোক দিবার চেষ্টায় ছিল, তাই এই বিবাহ দিয়া সে-সব দায় এড়াইয়া বাঁচিয়াছে।

কলেজের বন্ধুদের মুখে শুনিলাম,—আমি চলিয়া গেলে অশ্বিনী পাগলের মত আমার সন্ধান করিয়াছিল। আমার কলিকাতার ঠিকানা কেহ জানিত না—কাজেই বলিতে পারে নাই। আমার সঙ্গে অশ্বিনীর নাকি এই বিবাহের ব্যাপারেই ভারী জরুরি পরামর্শ ছিল।

রেবাকে যে-কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অশ্বিনী তবে কি তাহারই জবাব দিতে আসিয়াছিল! তবে কি রেবার কাছে আপনাকে ধরা দিয়াছিলাম,—সেই ভরসায় দেনার দায় কাটাইবার জন্য বেচারা অশ্বিনী আমারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল! কে জানে!

*　　　*　　　*　　　*

তারপর আজ বিশ-বৎসর পরের কথা বলিতে বসিয়াছি। সংসারের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় গিয়াছে রেবা, আর আমার তরুণ যৌবনের সেই অরুণ-স্বপ্ন! দুই মেয়ের বিবাহ দিয়া নাতি-পুতি লইয়া আমি এখন দস্তুর-মত সংসার ফাঁদিয়া বসিয়াছি। বাংলা নভেলে প্রেমের কথা পড়িলে গাঁজাখুরি বলিয়া সে বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দি!

এম-এ পাশ করিয়া হঠাৎ ধনী শ্বশুরের নজরে পড়িয়া তাঁর

একটিমাত্র কন্যার সহিত অনেকগুলি টাকা ঘরে আনিয়া পরম পরিতৃপ্তিতে কাল কাটাইতেছি। মফস্বলে ডাক্তারি চাকরি করি—পরিশ্রম কম, খাতির খুব,—বেশ নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিতেছে!

এই চাকরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে আজ চারমাস হইল, জামালপুরে আসিয়া উঠিয়াছি।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গৃহিণীর হাতে তৈয়ারী দুই-চারিটা সুখাদ্য মুখে তুলিতেছি, এমন সময় খপর আসিল, এক জরুরি অ্যাক্সিডেণ্ট কেশে এখনই বাহিরে যাইতে হইবে।

ভাড়া-গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। গৃহিণী মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু উপায় ছিল না! বাঙালী স্ত্রীরা কর্ত্তব্যের ডাক—এই জিনিষটার অর্থ বোঝে না। তারা চায় স্বামীগুলি তাহাদের গায়ে মাথা গুঁজিয়া আদর-সোহাগ লইয়াই—কিন্তু সে কথা থাক্!

রেলোয়ে-ব্যারাকের ধারে গিয়া একটা জীর্ণ বাংলার মধ্যে ঢুকিতে দেখি, সম্মুখেই পাঁচ-সাতটি ছেলে-মেয়ে খেলা করিতেছে—ছিন্ন মলিন বেশ,—সুকুমার মূর্ত্তিগুলি জরাজীর্ণ। তাহাদের ঘেরিয়া, সমস্ত স্থানটাকে ঘেরিয়া দারিদ্র্যের একটা শীর্ণ কঙ্কালখানা যেন খট্ খট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ভিতরে গেলাম। রোগশয্যায় শায়িতা এক তরুণী—রোগী। ইহাকেই দেখিতে হইতে। বয়স বেশী নয়, তবে দারিদ্র্যে আর অভাবে গায়ের চর্ম্ম বিশ্রী, কর্কশ হইয়া গিয়াছে। রূপ ম্লান, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে! তরুণী এককালে সুন্দরী ছিল বটে, এখন সৌন্দর্য্যের একটা খোলস্ মাত্র তাহার অঙ্গে লাগিয়া আছে। তরুণী অচেতন পড়িয়া আছে।

ব্যাপার শুনিলাম—মাতাল লম্পট স্বামী পয়সার জন্য তর্জ্জন করিয়া স্ত্রীর কাছে যখন পয়সা পায় নাই, তখন জুতা-শুদ্ধ পা তুলিয়া নিতান্ত পাষণ্ডের মতই পদাঘাতে বেচারীকে জর্জ্জরিত করিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ শুশ্রূষার পর রোগীর চেতনা হইল। রোগী চোখ মেলিয়া চাহিল। এ কি—এ যে আমার পরিচিত দৃষ্টি! কোথায় দেখিয়াছি? চমকিয়া উঠিলাম। ঠিক!—এ যে রেবা!

সবিস্ময়ে ডাকিলাম—রেবা—

না, ভুল নয়। তরুণী আমার পানে ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল—সুজিতদা!

তারপর দুইজনে নির্ব্বাক। কাহারো মুখে কথা নাই। রেবার দুই ডাগর চোখের কোলে মুক্তার মত দুই বিন্দু জল ফুটিয়া উঠিল। ফোঁটা বড় হইল—তারপর দুই গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। আমার বুক ফাটিয়া কতদিনকার একটা বিস্মৃত-প্রায় রুদ্ধ বেদনা তীব্র নিশ্বাসে ফুটিয়া বাহির হইল। আমি দুই হাতে রেবার চোখের জল মুছিয়া বলিলাম,—রেবা, তোমার এই দশা!

আমার বুকের উপর এক অসহ্য বেদনা পাহাড়ের মত চাপিয়া বসিয়াছিল চোখে জল আসিল।

রেবা আকাশের পানে একটা হাত উঠাইল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—প্রভুর ইচ্ছা!

কোন কথা বলিলাম না—বলিবার শক্তিও ছিল না। এই রেবা,—সেই রেবা! এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে ক্ষণিকের উত্তেজনায় যাহাকে বলিয়াছিলাম—

জিজ্ঞাসা করিলাম—অশ্বিনী কোথায় ?

—জানি না। এই বিয়ের ব্যাপার নিয়েই দাদার রাগ হয়। এ বিয়েতে কারো মত ছিল না। দাদাও এ বিয়ে বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হলো না—সবই প্রভুর ইচ্ছা !

হারে স্বার্থপর বর্ব্বর কাপুরুষ ! এই বিবাহ বন্ধ করার চেষ্টা হয়ত তোর সেই কথাটাকেই কেন্দ্র করিয়া ! কে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে তীব্র কশাঘাত করিল।

আমি আজ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে—আর আমার সেই প্রথম-যৌবনের কামনার ধন, রেবা—! কেন তাহাকে সেই সন্ধ্যায় আশার উচ্ছ্বাসে মাতাইয়া তুলিয়াছিলাম ! তার পর কাপুরুষের মত পলাইয়াছি... !

রেবাকে বলিলাম,—আমার ওখানে তুমি চল।...যাবে রেবা ?

রেবা বলিল,—না।

—আমার বাড়ীতে না হয় না গেলে, আমার বাড়ীর কাছে অন্য বাড়ীতে থাকবে,—আমার দেখবার সুবিধা হবে। ছেলে-মেয়েদের জন্যেও—?

তবু সেই এক উত্তর—না।

ঠিক ! ঠিক জবাব দিয়াছ, রেবা ! নারী, এই তেজেই দুর্ব্বল অসহায় হইয়াও লক্ষ্মীছাড়া বিশ্বে নিজেকে তুমি খাড়া রাখিয়াছ !

•

ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া উঠিলাম। উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। গাড়ীতে উঠিব, এমন সময় দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া আমার হাতে চারিটা টাকা গুঁজিয়া দিল, দিয়া বলিল,—আপনার ভিজিট।

কোন কথা বলিলাম না, বলিতে পারিলাম না—হাতটাও সরাইতে পারিলাম না। গরম আগুনের মত বোধ হইলেও টাকা চারিটা হাতেই রহিয়া গেল।

গাড়ী চলিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখিলাম, রেবার কি দীপ্ত মহিমাময় মূর্ত্তি! রাজেন্দ্রাণীর মত সিংহাসনে সে বসিয়া আছে—আর আমি তার সম্মুখ হইতে আমার ধিক্কৃত কুণ্ঠিত মনকে লইয়া নতাশরে সরিয়া পড়িবার জন্য পথ খুঁজিয়া মরিতেছি!

সুদূর

নবীন কবির পক্ষে ভক্ত পাঠক-লাভ কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। কমলের সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

বিপিন ছিল কমলের আশৈশব বন্ধু। এক গ্রামে দুজনের বাস। কমলের বাপ গ্রামের জমিদার, বিপিন সেই গ্রামেরই এক গৃহস্থ-ঘরের ছেলে। গ্রামের স্কুলে বিপিনের শিরে সরস্বতীর কৃপা অকুণ্ঠিত ধারে বর্ষিত হইলেও কমলের ভাগ্যে তার অভাব ঘটে নাই। বিপিনের জন্য অনেকখানি কৃপা বর্ষণ করিয়া অবশিষ্টটুকু কমলকে দান করিয়া সরস্বতী দেবী প্রসন্নই ছিলেন। ক্লাসে বিপিন প্রথম স্থান অধিকার করিত, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানটিতে কমলেরই ছিল অপ্রতিহত অধিকার। স্কুলের ছুটির পর কমল যখন আপনাদের ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইত, বিপিনের তখন সে ছাদে অব্যাহত প্রবেশ লাভ ঘটিত। বিপিন ধরাই দিত, কমল ঘুড়ি উড়াইত। সুতায় মাঞ্জা দিবার কল্পনা কমলের মনে উদিত হইবামাত্র বোতল-চূর ও বেলের আঠা প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া বিপিন যে কোথা হইতে নিমেষ-মধ্যে আবির্ভূত হইত, তাহা দেখিয়া কমলেরও তাক লাগিয়া যাইত। সে শুধু বিস্ময়ে সম্ভ্রমে বিপিনের পানে চাহিয়া থাকিত।

এইরূপে অর্থগত দারুণ বৈষম্যের ব্যবধান-সত্ত্বেও দুটি তরুণ-হৃদয় আশৈশব একসঙ্গে পাশাপাশি থাকিয়া এক হইয়াই বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা

একই স্রোতে বহিয়া চলিয়াছিল। তার পর এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া দুই বন্ধুতে কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিল।

গ্রামের স্নিগ্ধ পবন-শিহরিত কুঞ্জ-তলে শ্যামার শিষের মধুর স্পর্শ যে-হৃদয়ে কাব্য-প্রতিভার উন্মেষ ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই, সহরের রুদ্ধ আকাশ ও রুদ্ধ বাতাস সে-প্রতিভা জাগাইয়া তুলিল। সহসা একদিন নক্ষত্র-খচিত আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া আপনার গ্রামের কথা ভাবিতে ভাবিতে পাথর ঠেলিয়া কমলের প্রাণে নির্ঝরের মতই ভাব-ভাষা বিচিত্র ছন্দে কবিতার আকারে ঝরিয়া পড়িল। কমল কবিতা লিখিল। গ্রামের সেই ভাঙা ঘাট, জীর্ণ শিব-মন্দির, খেলার মাঠ ও নিভৃত ছাদের কোণ এক অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হইয়া কমলের বিরহ-তপ্ত প্রাণে সন্ধ্যার সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল। মায়ের আদর, ভাইয়ের ভালবাসা, আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ দূরত্বের ব্যবধান ঠেলিয়া কমলের মনকে এক অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিল।

সে রাত্রে কমলের ঘুম হইল না। কখন সকাল হইবে, বিপিন আসিবে? কবিতা লিখিয়া সুখ নাই, কাহাকেও তা' পড়ানো চাই! সে পড়ানোও আবার যাকে-তাকে নয়! প্রাণের যে প্রিয়জন, প্রাণের সমস্ত অলি-গলির যে সন্ধান জানে! যে শুধু কবিতার ছত্র দেখিয়াই তারিফ করিবে না, যে এই ছত্রগুলির অন্তরাল দিয়া একেবারে অতি সহজে কবির মনের মধ্যে প্রবেশ করিবে, কবিতার মর্ম্ম বুঝিবে, তাকে,—তাকেই পড়ানো চাই। সে লোক বিপিন।

এইরাত্রে যদি সমস্ত সহর-বাসী ছুটিয়া আসিয়া কমলকে বলে, ওগো তরুণ কবি, আমরা আসিয়াছি, শুনাও, শুনাও, তোমার

কবিতা শুনাও! তাহাতে কমলের তত আনন্দ হইবে না, যতখানি হইবে, একবার যদি বিপিন শুধু আসে! নিভৃতে তার পাশে বসিয়া বিপিনকে যদি এ কবিতা সে পড়িয়া শুনাইতে পারে, তবেই তার কবিতা লেখা সার্থক হয়! অধীর আগ্রহে একরূপ বিনিদ্রভাবেই কমলের সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

সকালেই বিপিন আসিয়া কমলের বাসায় উপস্থিত; নিত্য সে প্রাত ভ্রমণ সারিয়া কমলের এখানে চা খাইতে আসিত; আজও আসিল। কিন্তু চায়ের সঙ্গে সে আজ কমলের কবি-হৃদয়-নিঃসারিত যে আনন্দ-রস পান করিল, তাহাতে সে জুড়াইয়া গেল। মুগ্ধ বিস্ময়ে বন্ধুর ললাটে জয়-টীকা পরাইয়া বিপিন সে দিন যখন বিদায় লইল, তখন বেলা ন'টা বাজিয়া গিয়াছে।

সেদিন হইতে বিপিন ও কমলের মিলন-সূত্রে আর-একটা নূতন গ্রন্থি পড়িল। বন্ধন দৃঢ়তর হইল। তরুণ কবি বিহ্বল নেশায় কবিতা লিখিয়া যাইতে লাগিল এবং ভক্ত পাঠক নিত্য আসিয়া কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ চিত্তে কবির কণ্ঠে আশা-প্রশংসার বিজয়-মাল্য পরাইয়া দিতে এতটুকু অবহেলা রাখিল না।

তার পর ঝড় উঠিল। মানব-জীবনে এ ঝড় নূতন নয়,—এ ঝড় নিত্য বয়। এ ঝড়ে নিকট দূর হইয়া যায়, দূর নিকটে আসে। এ ঝড় বন্ধুকে বন্ধুর পাশ হইতে ছিনাইয়া দূরে ফেলিয়া দেয়, বন্ধুর সভায় নূতন আগন্তুককে টানিয়া আনিয়া মহা-সমাদরে আসন বিছাইয়া বসাইয়া দেয়।

কমল ও বিপিনের জীবনেও এ ঝড় দেখা দিল। সহসা একদিন প্রাতে উঠিয়া কমল দেখে, বিপিন নাই! পয়সার জন্য,

সংসারের জন্য বিপিন কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছে। এ দূরত্বকে চিঠির শৃঙ্খলে কিছুদিন বাঁধিয়া রাখা গেলেও চিরদিন বাঁধিয়া রাখা যায় না। চিঠি কাগজের শৃঙ্খল—কতটুকুই বা তার বল! সভায় এ দিকে নিত্য নূতন নূতন লোক আসিয়া দেখা দিতেছে—কত দিন তাদের ঠেকাইয়া রাখা যায়! তাদের কোলাহলে বাধ্য হইয়া তাদের পানে চাহিতেই হইবে। তাদের দাবী তারা ছাড়িবে কেন? যখন তারা পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন তাদের ঠেলিয়া চলিয়া যাইবার সাধ্য কি!

যশ! কি তাহাতে মোহ আছে! কি সে কুহক জানে! মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা ছাড়িয়া স্রোতের ফুলের মত ভাসিয়া যখন কমলের কবিতাগুলি বঙ্গবাসী নর-নারীর অন্তর-তট ছুঁইয়া যাইতে লাগিল, তখন তার পক্ষে চিঠির দুর্গে বসিয়া দূর-গত বন্ধুর পানেই চাহিয়া থাকা দুষ্কর হইয়া উঠিল। এখন কমল আর বিপিনের কবি নয়, এখন সে সকলের কবি, বাঙালার কবি! বিপিন শুধু আর তার একটিমাত্র পাঠক নয়, এখন তার পাঠক-সংখ্যা বহু। একের কাছে আগে সে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ধরিত, তাতে সুখ ছিল। এখন একের জায়গায় অনেক আসিয়া জুটিয়াছে। অনেকেও সুখ আছে, তার উপর অনেকে আর-একটা অতিরিক্ত-কিছু আছে। সে অতিরিক্ত-কিছু—নেশা! নেশার শক্তি অসাধারণ—সে শক্তি এড়ানো তরুণ কবির সামর্থ্যের বাহিরে।

বেচারা বিপিন কোন্ সুদূর গৃহ-কোণে পড়িয়া আছে। যারা কলরব-কোলাহলের মধ্যে থাকে, তাদের একটা সুখ আছে—

স্মৃতি তাদের জ্বালাইতে যায় না। স্মৃতি দুরন্ত হইলেও নারী; নারীর মতই তার সহজ কুণ্ঠা আছে। তাই সে ভিড়ে যাইতে ভয় পায়। কিন্তু যারা বিরস-ম্লান নীরব গৃহ-কোণে পড়িয়া থাকে, স্মৃতি তাদের বড় জ্বালায়! বিপিনেরও তাই ঘটিয়াছিল।

একা সে এক কোণে নিরালায় পড়িয়া থাকিত, স্মৃতি তাহাকে ছাড়িত না। নিভৃত নির্জন ঘরের কোণ। বাহিরের কলরব সেখানে গিয়া পৌঁছায় না। নীরব অবসরে সে তার স্মৃতির-দেওয়া পুঁথিখানা খুলিয়া বসে। পুঁথি জীর্ণ হইয়াছে, তবু তার কয়টা পৃষ্ঠা এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে! সেই পাতাগুলার পানে মৌন-মূক বিপিন চাহিয়া থাকে। চোখ তার জলে ভরিয়া যায়। ঝাপসা চোখে পুঁথির পাতাও মিলাইয়া আসে। নূতন ছবি অজ্ঞাতে তার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। সে ছবি কমলের। পত্র-পুষ্পে খচিত আলোর লহরে ভূষিত বিরাট সভা-মণ্ডপ —সে মণ্ডপের এক পাশে উচ্চ বেদী। বেদীর উপর বসিয়া কমল গান ধরিয়াছে। শিরে তার স্বর্ণময় মুকুট, ভালে জয়টিকা, ওষ্ঠে সস্মিত হাসি, মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি, আর তারই চারিধার ঘেরিয়া সারা বাঙলার লোক বসিয়া আবেশ-বিহ্বলভাবে সে গীতি-সুধা পান করিয়া ধন্য হইতেছে! সে সভায় সকলে আছে, সকলের উপর দিয়াই কবির প্রসন্ন স্মিত হাস্য অজস্র ধারে বহিয়া চলিয়াছে! নাই সেথা শুধু বিপিন। কৈ, কবির চোখ বিপিনকে খুঁজিতেছে না ত!

না, আজ আর বিপিনকে তার প্রয়োজন নাই! সুর সাধিতে হয় নির্জ্জনে। সে সময় একজন,—একজনের শুধু পাশে থাকা প্রয়োজন! যদি ভুল হয়, সে শুধরাইয়া দিবে! যদি ঠিক

হয়, সে তারিফ করিবে! আজ সুর সাধা হইয়াছে,—আজ আর তাকে কি প্রয়োজন!

উপরে উঠিবার সময় সিঁড়ির প্রয়োজন—কিন্তু উপরে উঠিয়া সিঁড়ির পানে চাহিয়া থাকা মূঢ়তা! সিঁড়ির কাজ তখন ফুরাইয়াছে। নামিবারও যখন প্রয়োজন নাই, তখন সে সিঁড়ি রহিল কি গেল, তা দেখিয়া কাজ কি!

কমলের খ্যাতি কাব্যের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া ক্রমে নাটকের ক্ষেত্রে দেখা দিল। দুই মাস ধরিয়া বাঙ্‌লার সংবাদ-পত্রে মাসিক পত্রে দুন্দুভি বাজিতেছিল, কবিবর কমলকুমার নাটক লিখিয়াছেন। বাঙ্‌লার প্রধান নাট্যশালা হীরক রঙ্গমঞ্চে সে নাটকের অভিনয় হইবে। মহাসমারোহে নূতন নাটকের মহলা চলিতেছে।

সুদূর প্রবাসে বসিয়া বিপিন সে দুন্দুভি-নাদ কাণে শুনিল। তার মাথার মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। এ সেই কমল, তার কমল! সে আজ বাঙ্‌লার সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক! আর সে—!

বিপিনের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সে বাক্স খুলিয়া কমলের চিঠিপত্রগুলা বাহির করিল। এই তার হস্তাক্ষর, এই তার হৃদয়! চিঠির পর চিঠি খুলিয়া বিপিন পড়িতে লাগিল। কৃপণের ধনের মতই চিঠিগুলিকে সে বুকে করিয়া রাখিয়াছে। এই সেই প্রথম চিঠি! আট পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া চিঠি! ভাদ্রের কূলে কূলে ভরা নদীর মতই কমলের সমস্ত হৃদয়টুকু এই আট পৃষ্ঠায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে! তার পর—? চিঠির পাতার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও শুড়াইয়া গিয়াছে! শেষে—আজ তিন বৎসর চিঠির

আর দেখা নাই। শেষ চিঠিখানি তিন বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা! শুধু দুইটী ছত্র—"মাসিক-পত্রের তাড়ায় চিঠি দিতে অবসর পাই না। ক্ষমা করো। কেমন আছ?"

শুধু এই কয়টি কথা। 'অবসর পাই না!'—একখানা চিঠি দিবারও অবসর হয় না? এত কাজ! বিপিনের সমস্ত বুক-খানাকে নাড়া দিয়া একটা প্রবল নিশ্বাস ঝড়ের মতই বেগে ছুটিয়া বাহির হইল। এ চিঠি নয়, বিদ্যুৎ-শিখা! এ শিখা বিপিনের প্রাণখানাকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে!

বহুত কাকুতি-মিনতি করিয়া এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বিপিন কলিকাতায় আসিল। সেদিন শনিবার। হাবড়ার পুল পার হইতেই রাস্তায় একটা বাড়ীর দেওয়ালের উপর বিপিনের নজর পড়িল। নানারঙের চিত্র-বিচিত্র-করা বড় অক্ষরে ও কি লেখা!—কবিবর কমলকুমার রায়ের নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক, মণি-হার।

উত্তেজনায় বিপিনের মাথার শিরা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল, বুকের মধ্যে রক্ত নাচিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর নাট্যশালার সম্মুখে গিয়া সে দেখে, কি ভিড়! সারা সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! সকলের মুখে মণি-হারের কথা, কমলের কথা! দলে দলে লোক টিকিট কিনিয়া নাট্যশালায় প্রবেশ করিতেছিল। বিপিন উদ্গ্রীব চিত্তে কার আশায় চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল! আলোর চমক্ দিয়া ট্রামগাড়ী থামিয়া আরোহী নামাইয়া আবার ছুটিয়া চলিয়াছে। মোটর, জুড়ি সশব্দে আসিয়া নাট্যশালার সম্মুখে

দাঁড়াইতেছে, বিপিন চারিদিকে চাহিয়া নিতান্ত অপরাধীর মতই সঙ্কুচিতভাবে আপনার মনিব্যাগ খুলিয়া একটি টাকা বাহির করিল। টাকাটি বাহির করিয়া আবার চারিধারে সে চাহিয়া দেখিল। যেন সে কত-বড় অপরাধী!—যেন সে চুরি করিতে যাইতেছে। এমনি বিবর্ণ তার মুখ, এমনই দীপ্তিহীন তার দুই চোখ! তার মনে হইল, ভিড়ের মধ্য হইতে যত লোক ব্যঙ্গ-কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তারই পানে যেন চাহিয়া রহিয়াছে! বিপিনের পা কাঁপিতেছিল, গা টলিতেছিল। মাতালের মত টলিতে টলিতে যাইয়া টিকিট-ঘরে কোনমতে টাকাটা ফেলিয়া দিয়া সে একখানি টিকিট কিনিল, কিনিয়াই দ্রুত পদে নাট্যশালার মধ্যে প্রবেশ করিল।

নাট্যশালা তখন লোকের ভিড়ে গম-গম্ করিতেছে। অধীর দর্শকের কলরব-কোলাহল বিপুল জল-কল্লোলের মতই শুনাইতেছিল। কেহ সিগারেট টানিতেছে, কেহ পান খাইতেছে। সম্মুখস্থ পটের পিছনে এখনই যে বিরাট ছন্দ জাগিয়া উঠিবে, নিঃশেষে তাহা উপভোগ করিবার জন্য সকলেই যেন প্রস্তুত হইয়া রহিতেছে।

ঐক্যতান বাজিল। এইবার! বিপিনের অঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হইতেছিল। একবার সে উপরের পানে চাহিল। ঐ যে রাজাসনে বসিয়া—কমল! পাশে তার অসংখ্য ভক্ত! কমলের মুখে কুণ্ঠিত স্মিত হাস্যরেখা! দর্শকের পানে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতেই যেন সে চাহিয়া দেখিতেছিল। কমল কি তাকে দেখিবে না? বিপিন কোথা হইতে আসিয়াছে! কেন আসিয়াছে? কিসের আকর্ষণে? সে কি তা বুঝিবে না? যদি না বোঝে?

বিপিনের মনে হইল, একবার সে চীৎকার করিয়া বলে;—হে বন্ধু, তোমার এ শুভ আনন্দের মুহূর্ত্তে তোমারই সহিত আনন্দের কথা উপভোগ করিতে আসিয়াছি। এই অযুত দর্শকবৃন্দের মুগ্ধ স্তুতি-কণ্ঠের সহিত আমিও আপনার কণ্ঠ মিলাইতে আসিয়াছি!

কিন্তু হায়, সে কথা কেমন করিয়া সে বলে! সে কথা কে মানিবে? রাজাসনে কবির পাশে ত আজ তার ঠাঁই নাই! সে যে আজ এই সাধারণ দর্শকের মত নিতান্তই একজন এক-টাকার দর্শক মাত্র।

পট উঠিল। একটা আনন্দ-সম্ভাবনায় দর্শকের দল স্তব্ধ হইল। অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রতি অঙ্কের প্রতি দৃশ্যের মধ্য দিয়া দর্শকের মন তন্ময়ভাবে চলিয়া কোন্ অদৃশ্য স্বপ্নলোকে বিলীন হইয়া গেল।

যখন অভিনয় থামিল, মুগ্ধ দর্শকদল সহসা তখন চেতনা-লাভে ক্ষুব্ধ হইল। ইহারই মধ্যে শেষ হইল! এ গান এখনই থামিল! এ যেন কোন নিপুণ ঐন্দ্রজালিক আপনার মায়া-যষ্টির বলে ম্লান ধরণী তলে স্বর্গের এক উজ্জ্বল অংশ ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল! দর্শকের দল মুগ্ধ কৃতজ্ঞ চিত্তে নাট্যকারের জয়-গানে নাট্যশালা মুখরিত করিয়া তুলিল।

বিপিন আবার উপরের পানে চাহিল। কমল চলিয়া যাইতেছে—সার্থকতার বিরাট আনন্দে তার মুখ ভরিয়া গিয়াছে! বিপিন দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে বাহিরে আসিল।

নাট্যশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একখানা মোটর গাড়ী বিজয়-

গর্ব্বে যেন ফুঁসিতেছিল! কমল আসিয়া গাড়ীতে বসিল, সঙ্গে আরও তিন-চারিজন ভক্ত আসিয়া উঠিল। জমকালো পোষাক-পরা কয়েকজন দর্শক আসিয়া কমলের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল। প্রশংসার ঘটা পড়িয়া গেল। বিপিন দূরে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতে লাগিল। তাহার মনে একটা দারুণ জ্বালা গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল! চোর! চোর ইহারা! কমলকে তার কাছ হইতে ইহারাই চুরি করিয়া রাখিয়াছে! প্রশংসা ইহাদের ওষ্ঠাগ্রেই শুধু লাগিয়া আছে! হৃদয়ের গোপন তল অবধি তার শিকড়টা পৌঁছিয়াছে কি না, সন্দেহ! ইহাদেরই কথায়, ইহাদেরই অলস চাটুবাণীতে কমল এতখানি ভুলিয়া রহিয়াছে! বিপিনের মনে হইল, দুরন্ত রোষে ইহাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকলকে সে তাড়াইয়া দেয়—কমলকে আপনার দুই বাহুর নিবিড় বন্ধনে চাপিয়া ধরিয়া বলে, বন্ধু, কাদের কথায় তুমি ভুলিয়া রহিয়াছ! ইহারা তোমার হৃদয়ের কি খপর রাখে! শুধু বাহিরের একটুখানি দেখিয়াছে বৈ নয়! তুমি এস আমার কাছে, তুমি এস আমার বাহুর নিবিড় বাঁধনে, তুমি এস আমার হৃদয়ের মধ্যে! যে-হৃদয়ে শুধু তোমারই আসন, তোমারই ঠাঁই! ইহাদের কাজ আছে, কলরব আছে, আরও অনেক আছে, কিন্তু আমার শুধু তুমি আছ, শুধু তুমি! কবি তুমি, মানুষ তুমি, কমল তুমি—

কিন্তু কিছুই বলা হইল না! মোটর গাড়ী কমলকে বুকে লইয়া চলিয়া গেল। বিপিনের যখন চেতনা হইল, তখন সে দেখিল, দর্শকের দলে গাড়ী ভাড়া করিবার বিষম গণ্ডগোল চলিয়াছে এবং কাঠের পুতুলের মতই নিস্পন্দভাবে সে নাট্যশালার

গাড়ী-বারান্দার একটা থাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তার চোখের সম্মুখে রাস্তার আলোগুলা কুয়াসা-ম্লান তারার মতই মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে এবং দর্শকের কোলাহল স্বপ্ন-শ্রুত অস্পষ্ট ধ্বনির মতই কানে আসিয়া বাজিতেছে।

স্বখাত সলিল

বৈশাখ মাসে অনঙ্গর বিবাহ হইয়াছে। বধূ চুনি জমিদারের মেয়ে— ক'দিন মাত্র শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া আবার পল্লীগ্রামে বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনঙ্গর এবার পাশের পড়া—পাছে পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, সেজন্য মা বৌকে আর আনেন নাই! ইচ্ছা থাকিলেও ছেলের পাশের পূর্ব্বে আনিবার জো নাই।

চুনি লেখাপড়া তেমন জানে না। বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিবার সময় তার বর্ণ-পরিচয় হয়। তবে ফুলশয্যার রাত্রে অনঙ্গর কাতর মিনতিতে গলিয়া চুনি কথা দিয়াছে, এই ক'মাসের মধ্যে দিদির কাছে সে লেখাপড়া ভাল করিয়া শিখিয়া ফেলিবে। দিদি ননী বাল-বিধবা, পিত্রালয়েই থাকে। তাহাকেও অনঙ্গ পাকে-প্রকারে জানাইয়াছে, লেখাপড়া যে না জানে,—তা সে পুরুষ হোক, আর নারীই হোক—তার জীবন একেবারে ব্যর্থ! এমন কি, তার সংস্পর্শে যে আসে, তার জীবনও ব্যর্থ হইয়া যায়। ননীও ভরসা দিয়াছে, বাড়ীতে ত তেমন কোন কাজ নাই—চুনিকে সে নিজে ভাল করিয়া পড়াইবে এবং লেখাপড়া শিখাইয়া অচিরে তাহাকে অনঙ্গর যোগ্যা করিয়া দিবে!

চুনি চলিয়া যাওয়ার পর হইতে—হোক সে দু'দিনের আলাপ-পরিচয়—অনঙ্গর দিন কি করিয়া কাটিতেছে, তা সে-ই জানে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র—উঃ, চারিটা এ মাস গিয়াছে না যুগ গিয়াছে! বৈশাখ মাসে চুনির সঙ্গে দেখা,—সে

যেন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়! আবার কবে দেখা হইবে, কে জানে!

পূজার সময় অনঙ্গর শ্বশুর বেয়ানকে বিস্তর প্রণাম জানাইয়া চিঠি লিখিলেন, বাড়ীতে পূজা, জামাতা বাবাজীকে একবার পাঠাইলে সকলে কৃতার্থ হন; দেশের লোকও তাহাকে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল। অন্তত পূজার সময় ঐ ক'টা দিনের জন্তও—অবশ্য বাবাজীর পড়ার যদি কোন ক্ষতি না হয়—বাবাজীকে পাঠাইতে পারিলে তাঁহারা অনুগৃহীত হইবেন। তাঁহার মাতৃদেবীর সনির্বন্ধ অনুরোধ। অনুমতি পাইলেই তিনি লোক পাঠাইবেন।

অনঙ্গ আহারে বসিয়াছিল। মা আসিয়া শ্বশুরের চিঠি পড়াইয়া বলিলেন,—কি রে, যাবি?

অনঙ্গ জলের গ্লাস মুখে তুলিয়াছিল; একটা বিষম খাইয়া গ্লাস নামাইল। মা বলিলেন,—ষাট্, ষাট্! তা ত্যাখ্ বাপু, তোর যদি পড়ার ক্ষতি না হয় বুঝিস্—

পড়ার ক্ষতি! পড়া! পড়া! জীবনটা যেন শুধু নোট্ মুখস্থ করার জন্তই সৃষ্ট হইয়াছিল! পরীক্ষায় পাশ হইলেই মানুষ চতুর্ভুজ হইবে! আর কোন কাজ নাই! মনটাকে আনন্দ-রস দিবার প্রয়োজন নাই! শুধু কলেজের কেতাবগুলা ষ্টীম-রোলারের মত মনটাকে অহোরাত্র পিষিয়া বিস্তাটাকে হাড়ে হাড়ে গাঁথিয়া দিলেই দুর্লভ নর-জন্ম সার্থক হইবে আর কি!

অনঙ্গ একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—কোথায় নামতে হয়, কি রাস্তা—

মা হাসিয়া বলিলেন,—তোকে ত আর তত্ত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছি না, বাপু—তাদের লোক এসে নিয়ে যাবে।

—কবে যেতে হবে ?

—ষষ্ঠীর দিন না হয় যাস্—তাই লিখে দেব।

—কিন্তু বিজয়ার প্রথম প্রণাম আমি তোমার পায়েই করতে চাই, মা—সকলের আগে তোমায় প্রণাম করা চাই।

ছেলের কথা শুনিয়া মার মন ভিজিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—তা কতক্ষণেরই বা পথ! নবমীর দিন রাত্রের গাড়ীতে বেরুলে বিজয়ার দিন দুপুর বেলায় এখানে এসে পৌঁছুতে পারবি'খন।

অনঙ্গর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এতখানি ভক্তি দেখাইয়া এটুকু সে বিলক্ষণ আশা করিয়াছিল যে মাও স্নেহ-বাৎসল্য দেখাইবেন, এবং পূজার ছুটিটা শ্বশুর বাড়ীতেই কাটাইয়া আসিতে বলিবেন। আহা, তাদের কি সাধ যায় না, নূতন জামাইটিকে লইয়া দু'দিন আমোদ-আহ্লাদ করে! কিন্তু তাহা ঘটিল না।

তখন সে ভাবিল, যাক্, কত দিন, কত দিন পরে চুনির সঙ্গে দেখা হইবে ত! সেই কবে বৈশাখের এক স্নিগ্ধ উষায় দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে—চুনি যখন গাড়ীতে ওঠে, অনঙ্গ তখন নিজের ঘরে বিছানায় পড়িয়াছিল। আসন্ন বিরহ-বেদনায় বুক তার ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। নির্ম্মম গৃহ! বিদায়ের পূর্ব্বে চুনির সঙ্গে দেখা করানোটাও কেহ উচিত বলিয়া মনে করে নাই! তারপর চিঠি-পত্র লিখিয়া সেই

সদ্য পরিচয়টুকুকে জাগাইয়া রাখিবারও কোন উপায় ছিল না! কে জানে, আবার নূতন করিয়া পরিচয় ঝালাইতে হইবে কি না! এখানে তাহার মন মুহূর্ত্তের জন্যও চুনির কথা ভুলিতে পারে না—বই খুলিয়া সে বসে মাত্র, কিন্তু মন তার রঙীন্ ফানুসে চড়িয়া সেই অজানা পল্লীর কোন্ গৃহ-কোণে অহরহ এক বালিকার পিছনে উতলা হাওয়ার মতই ঘুরিয়া মরে! চুনিও কি সেখানে বসিয়া তার কথা এমন করিয়া ভাবে!

সপ্তমীর দিন বেলা বারোটার সময় অনঙ্গ শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিল। অভ্যর্থনার ধুম দেখিয়া সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিশ্রামের পর স্নান-আহার সারিয়া লইতেই দিদিশাশুড়ী বলিলেন,—একটু গড়িয়ে নাও, ভাই—রাত্রে গাড়ীতে ঘুম হয়নি ভালো।

এক সুমধুর সম্ভাবনায় অনঙ্গর প্রাণটা নাচিয়া উঠিল। সে নির্ব্বাক সম্মতি জানাইয়া দিদিশাশুড়ীর অনুসরণ করিল।

দক্ষিণের এক বড় ঘরের মেঝের উপর গদি-পাতা পাটি-বিছানো বিছানা ছিল। দিদিশাশুড়ীর ইঙ্গিতে অনঙ্গ আসিয়া বিছানায় বসিল। দিদিশাশুড়ী তাহাকে শুইতে বলিয়া সঙ্গিনী বালিকার দলকে তর্জ্জনের সুরে আদেশ দিলেন,—তোরা সব চলে আয়, দিকিন্—ও একটু ঘুমুক।

এক-জনের আসার আশায় এ-পাশ ও-পাশ গড়াইয়া অনঙ্গর শেষে বিরক্তি ধরিল—সে কিন্তু আসিল না। অনঙ্গর মনটা ক্ষেপিয়া উঠিবার মত হইল—এ কি ব্যবহার! সে কি তোমাদের এখানে দুইখানা লুচি খাইতে আসিয়াছে, না, তোমাদের জমিদারী-পূজার সমারোহ দেখাইয়া তোমরা তার তাক্ লাগাইয়া

দিতে চাও! সে ত কোনটারই ধার ধারে না। সে আসিয়াছে শুধু মিলনের ব্যগ্র প্রত্যাশা লইয়া—বিরহের গ্লানি মুছিতে! সে কথাটা কেহই কি খেয়াল করিবে না? অনঙ্গ ভাবিল, জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার সঙ্গে দেখা হইলে ইহার একটা বোঝা-পড়া সে করিয়া লইবে। শ্বশুরের পুত্র-দুটি নেহাৎ নাবালক—তারা তাদের এই নূতন ভগ্নীপতিটির কাছে ঘেঁষ দিতে যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ করিল। দূর হইতে অনেকখানি সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই তারা তাদের কৌতূহল পূরণ করিয়া লইল। অনঙ্গ ভাবিল, তাহাদের একবার কাছে পাইলেও নয় চুনির কথাটা সে পাড়িয়া দেখে!

প্রকাণ্ড বাড়ী লোকের ভিড়ে গম্-গম্ করিতেছে। নানা চেহারার বিচিত্র নর-নারী তাহাকে দেখিয়া কৌতূহল মিটাইয়া লইতেছে, কিন্তু হায়, কোথায় তার সেই আপনার জনটি—চির-বাঞ্ছিতা প্রিয়া! তার চিত্তে কি একবিন্দু কৌতূহল নাই! চুনি কি তাহাকে ভুলিয়া গেল? কথাটা মনে হইতেই এক গূঢ় বেদনায় প্রাণ তার ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

এমন সময় শুভ্রবসনা এক কিশোরী আসিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে ডাকিল,—অনঙ্গ—

অনঙ্গ ফিরিয়া দেখে, জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা ননীবালা! সুন্দর মুখে সংযমের শান্ত মাধুর্য্য, ঠোঁটের কোণে সরল হাসির দীপ্তি! সমস্ত অবয়বে লজ্জার এক কমনীয় লালিত্য ফুটিয়া রহিয়াছে। ননীর হাতে শ্বেতপাথরের ছোট একখানি রেকাবি। রেকাবিতে জলখাবার। ননী দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিল,—বিন্দু, আসন নিয়ে এলি?

এক প্রৌঢ়া দাসী আসিয়া আসন পাতিয়া দিল; ননী জলখাবারের রেকাবি নামাইয়া কহিল,—নাও ভাই, বসো।

শ্বশুরবাড়ীর হৃদয়-হীন আচরণে অনঙ্গর একটু পূর্ব্বেই ভারী রাগ ধরিয়াছিল। কিন্তু এ মূর্ত্তির এই স্নেহময় সরল কণ্ঠস্বরে সে রাগ মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। ইহার কথার প্রতিবাদ করাও নিষ্ঠুরতা। অনঙ্গ গিয়া আসনে বসিল।

ননী কহিল,—ওবেলায় পুজোর কাজে ব্যস্ত ছিলুম, তাই আসতে পারিনি, ভাই। কিছু মনে করো না। চুনিকে এত বোঝালুম, ঠাকুমা কত টানাটানি করলে, তা মেয়ে একেবারে লজ্জায় ঘাড় গুঁজে পড়ে রৈল। এত লোকজনের মাঝে—ছেলেমানুষ কি না—লজ্জায় আসতে পারলে না। এই গোলমাল—। তা তুমি ত দু-চার দিন আছ!

অনঙ্গ ঘাড় হেঁট করিয়া জানাইল, না, কালই তাকে যাইতে হইবে—কাল নেহাৎ না ঘটে ত নবমীর দিনে যাওয়া চাইই। বাড়ীতে বিস্তর কাজ—দু দিনের জন্যও যে এই আসিতে হইয়াছে, সে একেবারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাত্রি বারোটার সময় যাত্রা আরম্ভ হইল। জমিদার-বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান লোকে লোকারণ্য। শ্বশুর নব-জামাতাকে লইয়া আসরে বসিলেন; অনঙ্গ প্রমাদ গণিল। গেল রে, আজ রাত্রেও বুঝি চুনির সঙ্গে দেখার আশা একবারেই ঘুচিয়া গেল! রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। এ কি অসহ্য বেয়াদবি! হাতে পাইয়া এমন ভাবে অপমান করা! হও না তোমরা জমিদার—হোক্ না কেন লক্ষ টাকা তোমাদের আয়—দেশের লোক আর সরকারের

কাছে থাকুক না তোমাদের খাতির! অনঙ্গও জামাই! তারও একটা প্রাপ্য খাতির আছে! সে ত আর পাড়াগাঁয়ের অজ ভূত নয় যে যাত্রার সং দেখাইয়া ভুলাইয়া দিবে! সে কি এতটা পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, তোমাদের এই পল্লীগ্রামের মজলিসে বসিয়া ঐ লক্ষ্মীছাড়া তামাসা দেখিবার জন্য?

অথচ এ বিষয়ে প্রকাশ্য কোন ইঙ্গিত করাও ভাল দেখায় না—আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে। অনঙ্গ ভাবিল, একটা ফিকির করা যাক্। সে সেই আসরে বসিয়াই নিদ্রার ভাণ করিল। ঔষধ ধরিল। শ্বশুর কহিলেন,—তোমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়গে বাবা—

তখনই ভৃত্যের প্রতি আদেশ প্রচার হইল। ভৃত্য জামাইবাবুকে উপরকার ঘরে আনিয়া খাটের উপর শয্যা দেখাইয়া দিল।

রাত্রেও আশার সেই নিষ্ঠুর ছল-অভিনয়। ঘরের বাহিরে কাহারও নূপুরে সবনের মৃদু রাগিণী বাজিয়া উঠিল না—কাহারও চরণ-শব্দ পাওয়া গেল না! অনঙ্গর বুকটা অসহ্য দুঃখে ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। শুইয়া শুইয়া রাগে সে ফুলিতেছিল। প্রতিশোধ লইবার দারুণ বাসনা মনের মধ্যে বিষম ঝড় তুলিয়া দিল। তীব্র জ্বালায় অস্থি-পঞ্জরগুলা তার জ্বলিয়া ছাই হইতে লাগিল। তার পর এই অকরুণ দেশের অকরুণ আচরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

সহসা তার মনে হইল, পায়ের তলায় কে যেন আসিয়া বসিয়াছে! কার এ কোমল স্পর্শ! চুনির! অনঙ্গ চোখ খুলিল

না। পায়ের কাছে নির্ব্বাক মূর্ত্তি নির্ব্বাক-ভাবেই বসিয়া রহিল। থাক্ বসিয়া—অনঙ্গ কখনই চুনির পানে চাহিয়া দেখিবে না, কোন কথা কহিবে না! রাত্রিটা কোন মতে পোহাইলে হয়, সকলের প্রাণে প্রতিশোধের এমন মুষল হানিয়া সে প্রস্থান করিবে! কাহারো সঙ্গে কথা কহিবেনা—এখানে জল স্পর্শও করিবে না—দুই-চারিটা কথা যদি কহিতেই হয় ত তাহাতে এমন ঝাঁজ সে মিশাইয়া দিবে যে, সকলে বুঝিবে, হাঁ, এও একটা মানুষ! ইহারও খাতির করা চাই! জমিদারের জামাই বলিয়া সে যে অনাদর সহিয়াও পোষা কুকুরটির মত নিরীহ আবদারে লেজ নাড়িবে, তেমন পাত্র সে নয়!

ঐ যে পদতলাসীনা উঠিয়া দাঁড়াইল! অনঙ্গ চোখ চাহিল না। চুনি আসিয়া তার বুকের উপর মুখ রাখিল, কহিল,—আমায় মাপ কর লক্ষীটি, লোকের ভিড়ে আমি আসতে পারিনি—পাছে সকলে ঠাট্টা করে!

অনঙ্গ তবু কোন কথা কহিল না। সে বড় বেদনা পাইয়াছে—এত বড় অপরাধ, এত সহজে তা ক্ষমা করা চলে না। চুনি বুকে মাথা রাখিয়া কহিল,—কথা কবে না?

রাগে অনঙ্গর সমস্ত মনটা তখনও জ্বলিতেছিল। চুনিকে সজোরে ঠেলিয়া সে বুক হইতে সরাইয়া দিল। একটা শব্দ হইল। অনঙ্গর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সভয়ে সে উঠিয়া বসিয়া দেখে, কোথায় চুনি! কোথায় কে! এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নের ঘোরে পাশ-বালিশটাকেই চুনি কল্পনা করিয়া ঠেলা দিয়া একেবারে খাটের নীচে ফেলিয়া দিয়াছে! বাহিরে জুড়ির দল তখন চীৎকার স্বরে গান ধরিয়াছে,

ও রাই বসে আছ নিদ্রে ছেড়ে যারি আসার আশায়—
ওগো, যামিনী সে পোহায় সুখে চন্দ্রাবলীর বাসায়।

ওধারে যাত্রা খুব জমিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে অনঙ্গ জানাইল, আজ তাকে বাড়ী ফিরিতেই হইবে। না গেলে বিস্তর ক্ষতি হইবে! যাওয়া চাইই!

শ্যালিকা ননীবালা আসিয়া বুঝাইল, শ্বশুর বুঝাইলেন, দিদি-শাশুড়ীও বিস্তর কথা পাড়িলেন, কিন্তু অনঙ্গর সঙ্কল্প অটল, অচল। অগত্যা সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন।

বেলা তিনটায় ট্রেন। বারোটার সময় আহার শেষ হইলে ননীবালা চুনিকে অনঙ্গর ঘরে টানিয়া আনিল এবং একটা পুঁটুলির মতই ঘরের কোণে ধুপ্ করিয়া তাকে নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইতে চট্‌পট্ দ্বারে শিকল টানিয়া দিল।

অনঙ্গ কোন কথা না কহিয়া খাটের উপর গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এমন-ভাবে কাটিয়া গেলে সে এক নিশ্বাসে কহিল,—আমি চললুম চুনি, তোমার হাড়ে বাতাস লাগবে, এবার। আর কখনো তোমার পথে বিঘ্ন হয়ে এসে দাঁড়াব না। তুমি এখানে পরম সুখে নিশ্চিন্ত চিত্তে থাকতে পারো। ভেবো, তোমার লক্ষ্মীছাড়া স্বামীটা মরেছে, তোমার আপদ দূর হয়েছে— আজ থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিলুম! তোমার ছুটি, ছুটি চিরদিনের জন্য ছুটি!

এত বড়-বড় কথার খোঁচা যার প্রতি নিক্ষেপ করা হইল,

সে খোঁচা কিন্তু তার গায়ে বিঁধিলও না। কাপড়ের আবরণে কুণ্ডলী পাকাইয়াই সে বসিয়া রহিল। অনঙ্গ ভারী ব্যথিত হইল। আহা, এমন কথাগুলা যে-কোন উপন্যাসে বা কবিতায় গুঁজিয়া দিলে কতখানি করুণ রস সে উথলাইয়া তুলিতে পারিত, পাঠকের শ্বাসরোধ হইয়া যাইত, চোখ ছল-ছল করিত,—আর সেগুলা কি না এই মূর্খ অজ্ঞ বালিকার বাক্‌হীনতার কঠিন অঙ্গে ঠেকিয়া একেবারে ব্যর্থ, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! হায়রে অদৃষ্ট, এই কথায় পাষাণী প্রিয়া একটুও চঞ্চল হইল না। এ দুঃখ যে রাখিবার ঠাঁই নাই।

অনঙ্গ উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া চুনির মুখের কাপড় টানিয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিল,—চুনি—

চুনি চমকিয়া তার আয়ত নয়নের এমন একটি নির্ব্বাক্‌ সজল দৃষ্টি অনঙ্গর মুখের উপর স্থাপিত করিল যে, তাহাতে অনঙ্গর সর্ব্বশরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া উঠিল। সে-চোখের ভাষা বড় করুণ, বড় তীব্র! সকল মৌনতাকে নিমেষে সে মুখর করিয়া তুলিল। অনঙ্গ চুনির হাত ধরিয়া তাহাকে খাটে বসাইল। বড় সুন্দর মুখখানি—নিদ্রা-হীনতার অস্পষ্ট ম্লানিমা সে সৌন্দর্য্যে বেশ মধুর একটি লালিত্যের ছায়াপাত করিয়াছে। অনঙ্গর সংযম টুটিল। সে সেই মুখখানি অজস্র চুম্বনে ভরাইয়া দিল। তার পর অনেক কথা সে কহিয়া গেল—এ কয়মাস চুনির অদর্শনে কি অসহ্য যন্ত্রণাই না সে ভোগ করিয়াছে। পূজার নিমন্ত্রণে কতখানি আশা বুকে লইয়া সে এখানে আসিয়াছিল। সে এখানে পূজা দেখিতে আসে নাই, যাত্রা শুনিতে আসে নাই। সে আসিয়াছিল শুধু তার জীবন-সর্ব্বস্ব চুনির এই

সুন্দর মুখখানি দেখিবার জন্য, তার সঙ্গে দুইটা প্রাণের কথা কহিবার জন্য!

চুনি মাথা নীচু করিয়া সব কথা শুনিল—তারপর ম্লান চোখে স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। যেজন্য তাকে এ ঘরে পাঠানো হইয়াছে, সেটা কোনমতে বলিয়া ফেলিলেই সে দায়-মুক্ত হয়—সেটুকু বলিবার জন্যই সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। বেশীক্ষণ এ ঘরে থাকিলে গঙ্গাজলের কাছে প্রকাণ্ড কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—এক-বাড়ী লোকের তীব্র বিদ্রূপ-দৃষ্টির সম্মুখে অত্যন্ত অপরাধীর মত দাঁড়াইতে হইবে,—টিটকারীও বড় অল্প সহিতে হইবে না! সে বড় গলা করিয়া সঙ্গিনীদের বলিয়াছিল,—আমার অমন বরকে দেখবার জন্যে প্রাণ ছটফট করে না!

বেশীক্ষণ এখানে থাকিলে এ দর্প কোথায় থাকিবে, তাই স্বামীর বক্তৃতা থামিলে প্রথম অবসরে সেই কথাটাই সে পাড়িয়া বসিল। অদর্শন, বিরহ যন্ত্রণা,—এ-সবের কোন ধার সে ধারিত না—মা ও ঠাকুমার শেখানো বুলিই আওড়াইয়া গেল। চুনি কহিল,—আজ ত তোমার থাকবার কথা ছিল। সকলেই বলছে, থাকো না!

—থাকা আর হয়না, চুনি।

—মা বলছিল, ঠাকুমা বলছিল, দিদি বলছিল—আজ তুমি মনে করলেই থাকতে পারতে!

—পারতুম, চুনি, কিন্তু এখন আর পারা যায় না। কাল রাত্রে তুমি যদি একটিবার আসতে, তাহলে আজ স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতুম।

—তবে যে বলছে, তোমার কি কাজ আছে—সেখানে!

চুনির মুখে দুষ্ট কৌতুকের হাসি ফুটিল।

অনঙ্গ বলিল,—সে কাজ এ ক'দিন পরেও হতে পারত।

—তবে বুঝি কাজের কথাটা মিছে করে বলেছে? চুনির ঠোঁটের হাসিটুকু আরও স্পষ্ট হইল।

অনঙ্গ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—তাই বটে! তোমার ওপর অভিমান করেই বলেছি। কি জন্যে থাকব এখানে? কেনই বা থাকবো? তোমার সঙ্গে দু'দিন মোটে দেখাই হল না।... কাল এলে না কেন রাত্রে? যাত্রা শুনছিলে, বুঝি?

—হ্যাঁ।

অনঙ্গ আবার একটা খোঁচা দিবার অভিপ্রায়ে কহিল,—যাত্রা কেমন শুনলে?

সুস্পষ্ট সহজ সুরে উত্তর মিলিল,—বেশ। তুমি উঠে গেলে কেন? বাবার কাছে বসেছিলে, আমি চিকের আড়াল থেকে দেখছিলুম! তোমার বুঝি ভাল লাগছিল না?

অনঙ্গ কহিল,—না। পরক্ষণেই একটু হাসিয়া সে আবার বলিল,—তুমি আমায় চিনতে পেরেছিলে? সেই ত কবে দেখেচ!

চুনি হাসিয়া বলিল, বা রে, তা বুঝি আর মানুষ চিনতে পারে না? তার উপর তোমার সে ফটোগ্রাফখানা মা যে বাঁধিয়ে আমাদের ঘরেই টাঙিয়ে রেখেছে।

—সে ফটোগ্রাফ তুমি রোজ দেখ! লজ্জা করে না? কেউ যদি ধরে ফেলে?

—সে ঘরে চব্বিশ ঘণ্টাই ত আর লোক থাকে না।

এ কথায় অনঙ্গ আনন্দ পাইল। তবে তো চুনি পাষাণী নয়—তার হৃদয় আছে!

বাহির হইতে এমন সময় ননী কহিল,—তোমার গাড়ী তৈরি, অনঙ্গ।

চুনি খাট হইতে একেবারে ঝাঁপাইয়া দূরে সরিয়া গেল, মৃদু কণ্ঠে কহিল,—তাহলে আসি। মাকে তাহলে বলব কি যে, আজ তোমায় যেতেই হবে?

এ কথার কোন উত্তর অনঙ্গ আর দিতে পারিল না। তার চোখে জল আসিয়াছিল। নিজের হঠকারিতায় নিজের উপর রাগও যে না ধরিয়াছিল, এমন নয়। নিজেই সে অধৈর্য্যের ঝোঁকে নিজের সুখটুকুকে পায়ে চাপিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়াছে! তার কলিকাতায় ফিরিবার কি এমন প্রয়োজন ছিল? কিছু না! তবে? শুধু রাগের মাথায় একটা কথার কথা বলিয়া ফেলিয়াছে বৈ নয়। কিন্তু সেই কথাটুকুর জন্যই যে কোনমতে আর থাকিয়া যাওয়া যায় না! লোকে কি ভাবিবে? প্রকৃত কারণটা এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে—সকলে উপহাসের হাসি হাসিবে! ওদিকে আবার গাড়ী অবধি প্রস্তুত! নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া তার প্রাণটা হায়-হায় করিয়া উঠিল। ব্যস্তবাগীশ হওয়ার এই ফল! ওরে লক্ষ্মীছাড়া, ওরে ধৈর্য্যহারা, আর-একটু ধৈর্য্য যদি ধরিয়া থাকিতিস্! আর-একটু—!

ননী ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—নেহাৎ চললে ভাই! আমাদের বড় কষ্ট রইল কিন্তু! ভাল করে দুটো কথা-পর্য্যন্ত কইতে পেলুম না! কি করব বল,—তোমার কাজের ক্ষতি হবে বলছ,—কাজেই আমরাও আর জেদ করতে পারি না। মা বড্ড দুঃখ করছিলেন।

অনঙ্গ ভাবিল, না হয় সে কাজের কথা বলিয়াই ফেলিয়াছে

তাহাতে মহাভারত এমন কি অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে তোমরা আর-একটু জেদ করিতে পারো না! সকলে মিলিয়া আর-একটু জেদ করিলেই যে থাকিয়া যাই! ওগো, কর গো, একবার তোমরা একটু জেদের-অনুরোধ কর!

কিন্তু হায়, সে অনুরোধ, সে জেদ কেহ করিল না। দিদি-শাশুড়ী শুধু বলিলেন,—বড়দিনের ছুটিতে আবার এসো, দাদা—এ আমোদ-আহ্লাদ কিছুই হল না।

শাশুড়ী পল্লীগ্রামের মেয়ে,—জমিদারী-বাড়ীর পুরাতন প্রথা ঠেলিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারেন না—অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বেচারা অনঙ্গকে যাইতে হইল। যাইবার সময় দিদিশাশুড়ীর দিকে চাহিয়া বাহিরে ঠোঁটের কোণে জোর করিয়া একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিলেও ভিতরটা তার ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছিল।

গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। পথের দুইধারে বাগানের সারি—বাগানের গাছ-পালা, শান্ত স্নিগ্ধ পল্লীর এই শ্যামল শ্রী, সমস্তই অনঙ্গর চোখে ঝাপ্‌সা ঠেকিতেছিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

এখনও যে আশা মোটেই নাই, এমন নয়! ট্রেনখানা যদি কোন-গতিকে ফেল করা যায়! আহা, তেমন ভাগ্য—

ঐ যে রেল-লাইন দেখা যায়—সিগনাল কৈ পড়িয়া নাই ত! অনঙ্গ ঘড়ি খুলিয়া দেখে, ট্রেনের সময় উৎরাইয়া গিয়াছে! তাঁর

আঁধার চিত্তের মধ্যে আশার একটু ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। আঃ!

কিন্তু ষ্টেশনে গিয়া সে শুনিল, টাইম্ হইয়া গিয়াছে বটে, তবে ট্রেন লেট্! শ্বশুরের যে কর্ম্মচারীটি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে কহিল,—আঃ, বাঁচা গেল। ট্রেন ফেল হলে আজ আমায় কম বকুনি খেতে হত! বাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, ট্রেন ধরিয়ে দেওয়া চাইই, নাহলে আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে।

কর্ম্মচারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পকেট হইতে ডিপা বাহির করিয়া একটা পান মুখে দিল, এবং বিড়ি কিনিবার উদ্দেশ্যে চুরুট-ওয়ালার সন্ধানে সরিয়া পড়িল।

অনঙ্গ অত্যন্ত হতাশভাবে প্লাট-ফর্ম্মের বেঞ্চে আসিয়া বসিল। তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল; মনে হইল, চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আলোক-বিন্দুতে পরিণত হইয়া একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রেত-নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে! এমন সময় ঢং ঢং ঢং-ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং রেলের কুলি হাঁকিল,—কলকাত্তা-যানে-ওয়ালা গাড়ী ছোড়া—টিকেট্-টিকেট্—!

বিপথে

দোতলার ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। ঘরের জানলা খোলা। অন্ধকার পথে দাঁড়াইয়া এক নারী সেই খোলা জানলার পানে চাহিয়াছিল। পথে জন-মানবের চিহ্ন নাই। নিশুতি রাত্রি। শুধু অদূরে থাকিয়া থাকিয়া দু-একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিতেছিল।

চারিধারে অন্ধকার আরও ঘনাইয়া আসিতেছিল। কে যেন নেপথ্যে বসিয়া সারা বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে-পিঠে লেপা কালির উপর মোটা তুলি দিয়া আরও নিবিড় করিয়া কালি লাগাইতেছিল। শুধু সেই বাড়ীর কাছে বড় তেঁতুল গাছটার ডাল-পালার উপর ঘরের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। মনে হইতেছিল, কে যেন এই আঁধার-কালো বিশ্বের ছোট এক কোণে খানিকটা আবীর ঢালিয়া দিয়াছে।

এক অব্যক্ত বেদনায় নারীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। পতঙ্গ যেমন আগুন দেখিয়া ছোটে, ঘরের ঐ অস্পষ্ট আলোটুকুর পানে নারীর সারা চিত্ত তেমনই আকুল আগ্রহে ছুটিতেছিল। প্রাণ পুড়িয়া যায়, তবু এ ছোটা কিছুতে রোধ করা যায় না!

নারীর ছিন্ন মলিন বেশ, শুষ্ক কেশে জটা ধরিয়াছে, মুখে-চোখে কালির দীর্ঘ রেখা!

আহা, ঐ আলো-করা ঘরখানি! আলোর পানে চাহিয়া চাহিয়া নারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বুকটা তাহাতে কতক যেন হাল্কা বোধ হইল। নারী ভাবিল, হায়, ঐ ঘর, অমনি আলো-

করা ছোট ঘর,—ও-ঘরে সে সর্ব্বময়ী ছিল যে! ও ঘরের মর্য্যাদা না বুঝিয়া সে হেলায় হারাইয়াছে!

কিন্তু আদরে-গৌরবে পরিপূর্ণ ঐ ঘর কিসের লোভে সে ত্যাগ করিয়া আসিল! আলেয়ার আলোয় মজিয়া বিপথে পড়িয়া সর্ব্বস্ব আজ সে খোয়াইয়া বসিয়াছে! এখন আর তাহা ফিরিয়া পাইবার এতটুকু আশা নাই, সম্ভাবনাও নাই! কঠিন উপেক্ষার বাণে আজ সে বিদ্ধ জর্জ্জরিত। মোহ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে! শুধুই কি তাই? সারা জীবনের উপর দিয়া কি প্রচণ্ড ঝড়ই না বহিয়া গিয়াছে! ঝড়ের শেষে আশ্রয়-চ্যুতা পাখীর মতই সে আজ নীড়হারা! এত-বড় পৃথিবী—তবু তার আজ দাঁড়াইবার কোথাও এতটুকু ঠাঁই নাই!

অতীতের কথা বিরজার মনে পড়িল। এমনই আলো-করা ঘরে বিবাহের পর ফুলশয্যা হইয়াছিল। আজ কি দিলে সেই অতীত দিন, অতীত মুহূর্ত্ত ফিরিয়া আসে! মদের নেশার মতই অতীত স্মৃতির নেশায় মাথা তার ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়রে, সে দিন আর ফিরিবার নয়!

সেই ঘরের পানে চাহিয়াই বিরজার সারা রাত্রি কাটিয়া গেল। তার কোন জ্ঞান ছিল না। ভোরের পাখী গাহিয়া উঠিতে চমক ভাঙ্গিল। দিনের আলো দেখিয়া কি-এক ভয়ে বুকটা দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেখানে আর তার দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস হইল না! যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে,—কে তুই? এখানে কেন? যদি তাড়াইয়া দেয়? ধীরে ধীরে সে দূরে সরিয়া গেল, কিন্তু বেশী-দূরও যাইতে পারিল না। মন্ত্র-স্পৃষ্ট সর্পের মতই সে সেই গৃহের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইল।

ক্রমে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। তিনটি ছেলে গৃহ হইতে পথে বাহির হইল। পিছনে ভৃত্য,—ভৃত্যের হাতে বইয়ের গোছা। ছেলেরা স্কুলে চলিয়াছে—বিরজা ছেলেদের পিছনে চলিল। তিনটি ছেলে! ওদের মধ্যে যেটি বড়, তার মুখখানি—হাঁ, ঠিক, কোন ভুল নাই! ও-মুখে সেই মুখখানিই কে যেন বসাইয়া রাখিয়াছে! এই মুখের ছায়া স্বপ্নে সে কতবার দেখিয়াছে—অস্পষ্ট ছায়া দেখাইয়া স্বপ্ন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! ভালো করিয়া দেখিবারও সুযোগ দেয় নাই!

বিরজার ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া ঐ ছেলেটিকে একবার সে বুকে তুলিয়া লয়, বুকে চাপিয়া ধরে—কোমল মুখখানি স্নেহের অমৃত-ধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া তোলে। তাহার ক্ষুব্ধ অন্তরের পাষাণ-স্তূপ ভেদ করিয়া আজ যেন সহসা স্নেহের নির্ঝর উথলিয়া উঠিয়াছে। সে বিমল স্নিগ্ধ ধারায় বিরজার প্রাণ জুড়াইয়া গেল।

ছেলেরা স্কুলে গেল; বিরজা ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। যদি আর একবার দেখা মেলে! ঢং ঢং করিয়া সাড়ে দশটার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। স্কুল বসিল। সমস্ত স্কুল-গৃহের বুক চিরিয়া একটা সুমধুর গুঞ্জন-ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—কর্ম্ম-রত মধুকরের গুঞ্জনের মতই তা জীবন্ত, সঙ্গীতময়! ছেলেরা পড়া করিতেছে, পড়া বলিতেছে। বিরজা উন্মাদের মত স্কুলের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্রমে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা, বারোটা বাজিয়া-বাজিয়া দেড়টার সময় টিফিনের ছুটি হইল। ছেলের দল উল্লাসে মাতিয়া

স্কুলের বহিঃ-প্রাঙ্গণে ছুটিয়া বাহির হইল। যেন খাঁচা হইতে পাখীর দল ছাড়া পাইয়াছে! তেমনই তাহাদের হর্ষোল্লাস! মার্বেল, কপাটি ও লুকাচুরি খেলার ধুম বাধিয়া গেল। এত ছেলে—কিন্তু সেটি কৈ? কোথায় সে? সে কি খেলিতে আসিবে না? তাহাকে দেখিবার জন্য বিরজার প্রাণ যে আকুল হইয়া রহিয়াছে!

ঐ না—ছুটিয়া-ছুটিয়া একবার বাহিরে আসিতেছে, আবার ছুটিয়া ভিতরে পলাইতেছে—পিছনে ছেলের দলও ছুটিয়া চলিয়াছে! সকলে লুকাচুরি খেলিতেছে। ঐ আবার বাহিরে আসিয়াছে। ও কি? তুইটা ছেলে উহাকে ধরিয়া উহার মাথায় চড় মারিতেছে—ছেলে মাথা গুঁজিয়া হাসিয়া সে-মার খাইতেছে! ওরে দস্যু, ওরে কঠিন, দে, দে, ছাড়িয়া দে—আহা, কেন মারিতেছিস্ রে! তোদের ও-খেলার প্রহারে এখানে বিরজার বুকে যে মুগুরের ঘা পড়ে। আহা দেখ্, দেখ্, বাছার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে!

স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা বাড়ীর পথে ফিরিল; বিরজাও পিছনে চলিল। এ কি আকর্ষণ! এ আকর্ষণের প্রভাব এত দিন বিরজা কেন বোঝে নাই! ছেলে! সে যে কি রত্ন, বিরজা পূর্ব্বে তা বোঝে নাই,—আজ বুঝিয়াছে বলিয়াই এটিকে সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখিবার জন্য আজ তার এমন আকুলতা, এত আগ্রহ!

এমনই ভাবে ছেলের পিছনে, বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া বিরজার তুই দিন তুই রাত্রি যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। সেদিনও সকালে পথে দাঁড়াইয়া

বিরজা জানলার ফাঁক দিয়া নীচেকার ঘরের মধ্যে আপনার ক্ষুব্ধ নয়নের আকুল দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছিল। ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের কাছে বসিয়া পড়িতেছে, আবদার ধরিতেছে, দুষ্টামি করিতেছে,—বিরজা তাহাই দেখিতেছিল! হায়, এমন স্বর্গ, এমন সুখ, এ ত তারও অনায়াস-লব্ধ ছিল, নিজের দোষে ধূলার মতই সে তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছে। আজ শত চেষ্টায় সহস্র সাধনায় এ স্বর্গের একটি কোণেও আর তার দাঁড়াইবার অধিকার নাই!

হঠাৎ একটা কঠিন কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙ্গিল,—কে? বিরজা চোখ ফিরাইয়া দেখে, গৃহ-দ্বারে ও,—কে ও! ভয়ার্ত্ত শিশুর মত সে দূরে পলাইয়া গেল—সেখানে দাঁড়াইয়া সে-মুখের পানে তাকাইবারও সামর্থ্য হইল না।

তবুও এ বাড়ীর মায়া, দেখিবার বাসনা কিছুতেই মিটিবার নয়! দৈত্যের মায়া-পুরীর মত এই বাড়ীখানা বিরজার পায়ে এক দুশ্ছেদ্য নিগড় আঁটিয়া দিয়াছিল। এক-একবার দারুণ ক্ষোভে যখন দূরে পলাইবার বাসনা হয়, দূরে পলাইবার চেষ্টাও সে করে, তখন এই বাড়ীখানাই আবার সেই অদৃশ্য সুদৃঢ় নিগড় ধরিয়া টানিয়া বিরজাকে ফিরাইয়া আনে। বিরজা কাঁদিয়া ফেলিল। সে কি পাগল হইবে!

কিন্তু পাগল হইলে সে আজ বাঁচিয়া যায়! অতীত স্মৃতিগুলা সাপের মতই ফণা তুলিয়া তার অন্তরে অহরহ দংশন করিতেছে, তীব্র বিষ ঢালিয়া দিতেছে! সে জ্বালা যে আর সহ্য হয় না! সহ্য করিবার শক্তি নাই, ধৈর্য্যও নাই!

• • •

পরদিন বাড়ীর দাসী গিয়াছিল দোকানে খাবার আনিতে,—

বিরজা আসিয়া তার শরণ লইল। মিষ্ট কথায় তার মন ভুলাইয়া সে খবর পাইল, বাবুর দুই সংসার। একটি ছেলে রাখিয়া প্রথমা মারা গিয়াছে—পাঁচ জনের অনুরোধে বাবু দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। এ-পক্ষে দুই ছেলে, এক মেয়ে। স্ত্রীটিও বড় ভালো। সতীন-পোর উপর যেমন টান, তেমনি ভালোবাসা! বাহিরের লোক দেখিলে কে বলিবে, সতীন-পো! ভালো জামা, ভালো কাপড় সবই তার। নিজের ছেলেরা আব্দার ধরিলে মা উত্তর দেয়,—ও পাবে না ত কে পাবে রে? ও যে সব্বার বড়, তোরা ছোট! আর ছেলেও তেমনই মা-বলিতে অজ্ঞান! এমন একগুঁয়ে ছেলে, পৃথিবীতে যদি কাকেও মানে! কিন্তু মার কাছে একেবারে জড়-সড়! বাবুও সুশীল-অন্ত প্রাণ! দাসী আরও বলিল, এ-সব কথা পাড়ার লোকের মুখেই সে শুনিয়াছে। বাড়ীতে 'সতীন-পো' কথাটি কি কাহারো মুখে উচ্চারণ করিবার জো আছে! তা হইলে আর রক্ষা নাই। বৌঠাকরুণের ত অমন মায়ার শরীর, তখন কোথায় থাকে, সে মায়া!

বিরজা মন দিয়া একটি-একটি করিয়া সব কথা শুনিল; শুনিয়া শুধু ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিল। দাসী বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিল, কহিল,—ওমা, তোর চোখে জল দেখছি যে।

বিরজা আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—না ভাই, চোখে কি-একটা পড়ল! বলিয়াই সে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিল। দাসী গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দোকানী কহিল,—ও একটা পাগলী। আজ ক'দিন থেকে দেখছি, এ পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অপরাহ্নে স্কুলের ছুটির পর সুশীল বাড়ী ফিরিতেছিল, সঙ্গে

ছিল ছোট ভাই দুটি ও কয়েকজন সঙ্গী। বিরজা অদূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল। সুশীল এ কয়দিন এটুকু লক্ষ্য করিয়াছে যে, এই উন্মাদনী নারী তাহাদের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়—বাড়ীর ধারেও সর্ব্বদা তাহাকে দেখা যায়! ইহার জন্ম প্রাণে সে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। রাগও যে হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহাকে তাড়াইতেও সাহস হয় না! কি জানি, একে পাগ্‌লী, চট্ করিয়া হাতটাই যদি ধরিয়া ফেলে! গাল দেয়! হাত ধরিয়া ফেলিলে পরিষ্কার জামাটা ত নষ্ট হইয়া যাইবে, তার উপর পথের মধ্যে লোকের কাছেও ভারী অপদস্থ হইতে হইবে! সে ভারী লজ্জার কথা!

আজ এই এতগুলা সঙ্গী নিকটে থাকিতে তার সাহসের অভাব হইল না। চলিবার সময় বিরজার পানে অলক্ষ্যে সে চাহিতে ভোলে নাই। তবুও কি আপদ! পাগলাটা কিছুতেই আর সঙ্গ-ছাড়া হয় না! আবার নজর তার সুশীলের পানেই! জ্বালাতন! সুশীল একজন সঙ্গীর কানে কানে কহিল,—দেখ্ ভাই, একটা পাগ্‌লী!

কথাটা বিরজার শ্রুতি এড়াইল না।

সঙ্গী বালক কহিল,—হ্যাঁ ত রে! ঢিল মারব?

সুশীল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—না, না, ঢিল মারে না—তার চেয়ে এক মজা করি, দেখ্।

সঙ্গী কহিল,—কি মজা?

সুশীল পকেট হইতে লজেঞ্জেস বাহির করিয়া মুখে পুরিল; খানিকক্ষণ সেটা চুষিয়া বিরজার পানে ছুড়িয়া কহিল,—এই নে পাগলী, লবঞ্চুস্—খা। সঙ্গীর দল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লজেঞ্জেসটা বিরজার গায়ে লাগিয়া পথে পড়িল। তার মনে হইল, আকাশের বাজ বুকে পড়িলেও বুঝি তার এমন বাজিত না। এই ছেলে—যাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য প্রাণ তার ছটফট করিতেছে, সে এমন বিদ্রূপ করিল? কৈ, পাষাণ বুক তবুও ভাঙ্গিল না ত! বিরজার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। কিন্তু উপায় নাই! এ বিষ ত তারই মন্থন-করা! যে পাপ সে করিয়াছে—এ তার উপযুক্ত ফল! উচিত শাস্তি! চোখের জল সামলাইয়া সে সেই লজেঞ্জেসটুকু বুকে চাপিয়া, তাহাতে চুমা দিয়া অন্তরে প্রথম আজ যে শান্তি অনুভব করিল, তা অপূর্ব! মাণিকের টুকরার মতই সযত্নে সে সেই লজেঞ্জেসটুকু আপনার অঞ্চলে বাঁধিল।

পরদিন সুশীল তখন স্কুলে গিয়াছে, অভয় বাড়ী নাই, বিরজা সাহসে ভর করিয়া অন্দরে ঢুকিল। ভৃত্য তাড়া দিয়া উঠিল,—সে তা গ্রাহ্যও করিল না; একেবারে ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। মৃণাল তখন শিশু কন্যার দুধের বাটি হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিল। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। হঠাৎ এক অপরিচিতা জীর্ণ-মলিন-বেশা শীর্ণা নারীকে একেবারে উপরে দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রথমটা সে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু বিরজার মুখে বিষাদের নিবিড় ছায়া, দুই চোখের কোণে সুগভীর কালির রেখা টানা দেখিয়া মায়া হইল। মিষ্ট স্বরে সে কহিল,—তুমি কে গা?

বিরজার মুখে চট্ করিয়া কোন কথা যোগাইল না। মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠিয়াছিল। এমন ঘর, এমন বারান্দা—

এমন সব—কিসের তার অভাব ছিল! ভিখারীর বেশে আজ এখানে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে। এখানকার কিছুতে তার অধিকার নাই—এখানে আসিয়া দাঁড়াইতে গেলে পরিচয় দিতে হয়!

মৃণাল কহিল,—তুমি কি চাও,—বল না?

কি চাই? বিরজার মনে হইল, সে বলে,—ওগো, কিছু নয়, কিছু চাই না—শুধু তোমার এই বাড়ীর কোণে একটু ঠাঁই দাও। তোমাদের উচ্ছিষ্ট উঠাইব, বাসন মাজিব, তোমাদের চরণ-সেবা করিব, দিনান্তে একটিবার শুধু তোমাদের ঐ ছেলেটিকে কোলে লইতে দিয়ো। কিন্তু না, সে কথা বলা চলে না—ভালো দেখায় না! এ যে পাগলের কথা! সে ত পাগল নয়! তার মুখে কোন কথাই ফুটিল না।

মৃণালের মনে হইল, বুঝি সে ভড়কাইয়া গিয়াছে। তাই আবার কহিল,—ভয় কি! বল, কি চাও? কিছু খাবে?

বিরজা ভাবিল, এত গুণ না থাকিলে আর আজ এমন গৃহে লক্ষ্মী তুমি! বিরজা কহিল,—আমি—আমি—

মৃণাল কহিল,—হ্যাঁ, কিছু খাবে কি?

—না, না, খাওয়া নয়, খাওয়া নয়—বল, আমার কথা রাখবে? বলিয়াই সে মৃণালের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। দুধের বাটি রাখিয়া মৃণাল সস্নেহে তার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইল, কহিল,—ছি, পায়ে হাত দিতে নেই। ওঠো—কি চাও, বল? যদি রাখবার হয়, কেন তোমার কথা রাখব না বোন্?

বিরজার চোখে জল দেখা দিল। সে কহিল,—আমি বড় অভাগিনী, বোন্। রাজার মত স্বামী, চাঁদের মত ছেলে, অগাধ

ঐশ্বর্য্য, আমার সব ছিল,—কিন্তু আজ কিছু নেই। পোড়াকপালী আমি, সে-সব খুইয়েছি—

করুণ সমবেদনায় মৃণালের অন্তর ভরিয়া উঠিল, মন ভিজিয়া গেল। একখানা মাদুর বিছাইয়া সে কহিল,—বসো ভাই—বসে বসে বল—

বিরজা বসিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে কহিল,—তোমার ঐ ছেলে,—বড়টি—তারই মত ছেলে! একেবারে তারই মত। তাই—তাই—

মৃণাল কহিল,—তাই—কি? বল।

বিরজা কহিল,—ওকে ক'দিন দেখে অবধি কোথাও আর আমি নড়তে পাচ্ছি না। বুকের মধ্যে সর্ব্বদাই যেন আগুন জ্বলছে। এ যে কি জ্বালা, বোন, তা কি বলব!

মৃণালের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—মধ্যাহ্নের প্রখর আলো তার চোখে ঝাপসা বোধ হইল। মুখ হইতে অস্ফুট করুণ স্বর ফুটিল,—আহা!

বিরজা কহিল,—তবু যাব,—আমায় যেতেই হবে। কিন্তু যাবার আগে একবার বড় সাধ হচ্ছে, তোমার ঐ ছেলেটিকে বুকে তুলে নি—বুকে চেপে ধরি—ও চাঁদ-মুখে দুটি চুমু খাই! তাহলে এ জ্বালা জুড়োয়—কতক জুড়োয়!

মৃণাল কহিল,—তার আর কি। তবে এখন ত ছেলে বাড়ী নেই, স্কুলে গেছে। সে ফিরুক্। তুমি বিকেলে এসো।

বিরজা কহিল,—কিন্তু তোমার স্বামী যদি আমায় দেখলে বকেন্? বাড়ীতে ঢুকতে না দেন?

মৃণাল কহিল,—তাঁকে আমি কিছু বলবো না। তুমি এসো—

কৃতজ্ঞতায় বিরজার প্রাণ পূর্ণ হইল। চোখের জল মুছিয়া আবার সে মৃণালের পায়ে হাত দিল। মৃণাল শশব্যস্তে হাত সরাইয়া দিয়া কহিল,—ও কি—ছি, ছি, পায়ে হাত দিচ্ছ কেন, ভাই?

—তাতে কোন দোষ নেই, দিদি। তুমি সতী-লক্ষ্মী, দেবতা! বেশী আর কি বলবো, দিদি,—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি চিরসুখী হও!

সুশীলের সেদিন স্কুল হইতে ফিরিতে দেরী হইল। যে-ভৃত্য আনিতে গিয়াছিল, সে আসিয়া সংবাদ দিল, ছুটির পর স্কুলে ম্যাজিক হইবে। মাষ্টারবাবু বলিয়া দিলেন, খোকাবাবুরা ম্যাজিক দেখিয়া তাঁর সঙ্গেই গৃহে ফিরিবে।

যথাসময়ে বিরজা আসিয়া মৃণালকে কহিল,—কৈ দিদি, ছেলে ত ফেরেনি এখনো। আমি স্কুলের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম, বেরুতে দেখলুম না ত!

মৃণাল তখন ম্যাজিকের কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া বিরজা বলিল,—তা হলে আমি আবার আসব। এখন যাই।

মৃণাল কহিল,—কেন, বসো না! ওপরে আমার ঘরে ততক্ষণ বসবে চল!

বিরজা জিভ্ কাটিয়া বলিল,—তোমার ঘরে কি আমি ঢুকতে পারি দিদি? ও যে লক্ষ্মীর ঘর! আমার বাতাস ও-ঘরে লাগা ঠিক নয়!

মৃণালের অজ্ঞাতে তার ক্ষুব্ধ অন্তর মথিত করিয়া ছোট একটি নিশ্বাস সন্ধ্যার বাতাসে মিলাইয়া গেল। মৃণাল ভাবিল, আহা উন্মাদিনী, অভাগিনী!

মস্ মস্ করিয়া অভয় আসিয়া উপরে উঠিয়া গেল। মৃণালের ডাক পড়িল। মৃণাল স্বামীর কাছে গেল। স্বামী বলিল,—ও কার সঙ্গে অন্ধকারে বসে কথা কচ্ছিলে?

—আহা, ও একটি মেয়েমানুষ—ছেলের শোকে স্বামীর শোকে মাথা ওর কেমন হয়ে গেছে!

—তা এখানে কেন? কিছু চায় ত দিয়ে বিদেয় করে এসো।

—ও একবার শুধু সুশীলকে দেখতে চায়। আহা, ওর যে ছেলেটি ছিল, সে না কি আমাদের সুশীলেরই মত দেখতে!

অভয়ের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—না, না, ও সব আবদার রাখে না! কোথাকার কে মাগী—অভয়ের স্বর শেষের দিকটায় চড়িয়া উঠিল।

মৃণাল বাধা দিয়া কহিল,—আহা, অমন কথা বলো না গো, —আজই না হয় ও এমন হয়েছে, তবু ওর মায়ের প্রাণ ত বটে!

মৃণাল কোন কথা না বলিয়া নীচে নামিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিরজা নাই, চলিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে স্নান সারিয়া গরদ পরিয়া মৃণাল পূজায় বসিতে যাইবে, এমন সময় মৃদু ভীত কণ্ঠে কে ডাকিল,—দিদি— মৃণাল মুখ তুলিয়া দেখে, সেই উন্মাদিনী।

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল, কহিল,—তুমি এই ঘরে এসো ভাই,—আমি সুশীলকে ডাকিয়ে পাঠাচ্ছি।

সুশীল তখন বাহিরে মাষ্টার মশায়ের সহিত গত রাত্রির ম্যাজিক লইয়া বিষম তর্ক তুলিয়াছিল এবং ম্যাজিক শেখাটা যে ভূগোল মুখস্থ করার চেয়ে অনেকখানি প্রয়োজনীয়, তাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। মাষ্টার মশায় তাকে কিছুতেই ম্যাজিকের অসারতা বুঝাইতে পারিতেছেন না, এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, মা ডাকিতেছেন। তর্কটা সেইখানেই মুলতুবি রাখিয়া সুশীল এক লম্ফে উঠিয়া মাতৃ-সন্নিধানে ছুটিল; কহিল,—কি মা? ডাকছ?

মৃণাল কহিল,—হ্যাঁ, একবার এ ঘরে এসো ত বাবা—

সুশীল ঘরে ঢুকিয়াই সেই উন্মাদিনীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। এই রে, মাগী বুঝি মার কাছে সেদিনকার লজেঞ্জেস ছোড়ার কথা বলিয়া দিয়াছে! বটে! আচ্ছা, পাগলীকে পরে মজা দেখাইব একবার।

বিরজার উপর একেই তার রাগ ছিল, আজ আবার মার কাছে তাকে দেখিয়া সে রাগ বাড়িয়া গেল। বক্র কটাক্ষে তার পানে একবার চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন মা? ডাকছিলে কেন? শীগ্‌গির বল। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আমার খুব হয়ে চলেছে। দেখ মা, মাষ্টার মশাই বলেন, ও ম্যাজিক-ট্যাজিক ও সব কিস্সু নয়! আচ্ছা মা, মাষ্টার মশাই ত এত জানেন, কত লেখাপড়া শিখেছেন,—কৈ, কওয়ান দেখি, কাটা মুণ্ডুকে কথা কওয়ান, কাটা পায়রাকে জ্যান্ত করে দিন ত দেখি। হ্যাঁ, তা আর পারতে হয় না!

বিরজা স্থির দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া রহিল। আহা, এমন ছেলে'! যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি! তার মনে হইল, ছেলেকে ডাকিয়া সে বলে, ওরে বাছা আমার, যাদু আমার, তুই মা বলিয়া ও কাকে ডাকিতেছিস? কে তোর মা—? ও নয় রে, ও নয়! আমি যে তোর ঐ তপ্ত স্পর্শটুকু পাইবার জন্য কাতর তৃষিত প্রাণে এখানে দাঁড়াইয়া আছি, আমায় একবার মা বলিয়া ডাক্! ওরে আমি, আমি, আমি তোর মা! এ ঘর, এই সব,—এ যে—

মৃণাল কহিল,—শোনো একবার ছেলের পাগলামির কথা! হ্যাঁ, ডেকেছি কেন, শোন্! ইনি একবার তোকে দেখতে চান—

—কে? এই পাগলী? যাওঃ—এই বুঝি? আমি বলি, কি!

সুশীল চলিয়া যায় দেখিয়া বিরজা ছুটিয়া তাহাকে ধরিল, ধরিয়া একেবারে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া তাহাকে বুকে চাপিল, চাপিয়া ছোট মুখখানি অজস্র চুমায় ভরাইয়া দিল।

সুশীল রাগে আগুন হইয়া হাত-পা ছুড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলচি আমাকে, পাগলী কোথাকার। আমি বাবাকে বলে দোব। ছাড়্ বলচি আমাকে!

অভয় নীচে নামিতেছিল। সুশীলের চীৎকার শুনিয়া পূজা-গৃহের সম্মুখে আসিল; বিরজা বাহিরে যাইতেছিল, তাকে দেখিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। মৃণালও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল। সুশীল বিরজার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইতেছিল।

অভয় আসিয়া কহিল,—কি! হয়েছে কি? সুশীল অত চেঁচাচ্ছিল কেন?

অভিমানের সুরে সুশীল কহিল,—দেখ না বাবা, ঐ পাগলাটা আমায় ঝাপটে ধরেছিল—মা ওকে কিছু বলচে না!

—কে পাগলা? বিরজা কি ভাবিয়া মুখ তুলিল—অভয়ের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিল। নিমেষের জন্য! তখনই বিরজা চোখ নামাইল। অভয়ও দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া আসিল। বিরজা অমনি ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অভয় মৃণালকে কহিল,—ওকে এখানে ঢুকতে দিয়েছিলে কেন?

মৃণাল ব্যথিত স্বরে কহিল,—আহা, বেচারা বড় দাগা পেয়েছে!

—দাগা পেয়েছে! তুমি তা হলে ওকে চিনতে পার নি!

মৃণাল যেন আকাশ হইতে পড়িল, কহিল,—কেন, কে ও?

—দেখবে, এস—বলিয়া অভয় আপনার শয়ন-কক্ষে গেল; মৃণালও তার অনুসরণ করিল।

আর্শির টেবিলের টানা খুলিয়া অভয় একখানা কাগজে-মোড়া ফটোগ্রাফ বাহির করিল। সে এক কিশোরীর প্রতিকৃতি। অভয় চেয়ারে বসিয়া আর তার কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া সে! ছবিখানা একটু অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; তবু একটা সুশ্রী মুখের ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়! ফটোখানা মৃণালের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া অভয় কহিল,—এই ছাখো—

মৃণাল দেখিল, দেখিয়া কহিল,—এঁ্যা—ও তবে?

—সে।

—দিদি!

—চুপ! দিদি নয়, পাপীয়সী, পিশাচিনী—! আমি ওকে দেখেই চিনেচি। আজ কদিন ধরে ওকে এই বাড়ীর ধারে ঘুরতে দেখচি!

মৃণাল স্বামীর পানে চাহিল, দেখিল, তাঁর দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারও চোখে জল আসিল।

চিঠি

পাড়াগাঁয়ের অনেক দিনের পুরোনো ভাঙ্গা-চোরা একখানা বাড়ী। তারি শাণ-বাঁধানো দাওয়া, মাঝে-মাঝে চটা উঠে গেছে। সেই দাওয়ার একধারে বারো বছরের একটি ছেলে, পাশে কড়ির দোয়াত আর শরের কলম; কাছে বসে এক বৃদ্ধা নারী। তাকে লক্ষ্য করে ছেলেটি বল্লে,—কি লিখতে হবে, বল পিশিমা? আমি আবার এখনি ও-পাড়ায় যাত্রা শুনতে যাব।

ছেলেটি যাকে পিশিমা বল্লে, ছেলের দল গ্রাম-সম্পর্কে তাকে পিশি বলে ডাকে। তা-ছাড়া তার সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই।

বৃদ্ধা বল্লে,—আমার ফেলিকে চিঠি একখানা লিখতে হবে, বাবা। আজ চার বচ্ছর তার কোন খপর পাইনি।

ফেলি তার ভাইঝী; আঁতুড়ে মা মারা গেলে এই পিশিই তাকে কোলে তুলে নেয়, মানুষ করে। এই পিশিকেই সে মা বলে জানে।

বৃদ্ধার দুই চোখ ছল-ছল করে এল। মনের মধ্যে চার বৎসর পূর্ব্বেকার এক করুণ বিদায়-দৃশ্য জেগে উঠল। বাড়ীর সামনে তাল-নারকেলের ছায়ায়-ঘেরা খানিকটা খোলা জায়গা—সেইখানে পাল্কী নামানো ছিল। ফেলি শ্বশুর-বাড়ী যাবে। জামাই রোজগেরে হয়েছে, ফেলিকে এবার নিজের কাছে নিয়ে

যাবে। জামাই গবদের কোটের উপর সোনার ঘড়ি-চেন ঝুলিয়ে আশে-পাশে গম্ভীর মুখে পায়চারি করে ফিরছিল। আঁচলে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে পিশি এসে ফেলিকে পাল্কীতে তুলে দিলে—মেয়েরও দুই চোখে সাগর বয়ে চলেছিল। পাল্কী উঠিয়ে বেহারারা যখন শ্যাওলা-পড়া পুকুরটাকে বাঁয়ে রেখে মেটে রাস্তা ধরে জাম গাছের ওধারে মোড় বেঁকল, মেয়ে ফেলি তখন পাল্‌কীর দুই দরজা ঠেলে সরিয়ে ঝাপসা-চোখে দূর থেকে পিশির পানেই চেয়ে ছিল। সকালের উঠন্ত সূর্য্যের স্নিগ্ধ রৌদ্রটুকু তাল-গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তার মুখের উপর ঝরে-ঝরে পড়ছিল—পিশিমা নিজের চোখের জলে অস্পষ্ট দৃষ্টি দিয়েও তা বেশ স্পষ্টই দেখেছিল। সে-চোখের সে-দৃষ্টি এখনো তার মনে গাঁথা রয়েছে,—সে কি ভোল্‌বার গো!......তারপর এই চার বছর ফেলির কাছ থেকে একখানি চিঠিও আসেনি! পিশি নিজে লিখতে জানে না; পাড়ার একে-তাকে ধরে মাঝে-মাঝে অমন কত চিঠি লিখিয়েছে—তার একখানার জবাবও কি দিতে নেই?...সে কি সব ভুলে গেল! পিশির আর কে আছে? কেউ না! সেই পিশিকে খপর দিতে সে সময় পায় না! সে রইল কি গেল, তারও কি কোন উদ্দেশ নিতে নেই!......পিশির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—কে জানে, তার ফেলিই যদি না থাকে—! থাকলে সত্যিই কি আর সে পিশির খোঁজ নিত না!...পিশির নিজের যাবার উপায় নেই—সে যে জামাই-বাড়ী! নাহলে সে অমন এতদিনে দশবার ছুটে যেত!

পাড়াগাঁয়ে ডাকওলা হপ্তায় দু'দিন এসে চিঠি বিলি করে

যায়। যে-যে দিন তার আসবার পালা, পিশি তার আশা-পথ চেয়ে বসে থাকে। দূর থেকে তাকে আস্তে দেখে প্রাণটা কি আশায় যে ভরে ওঠে! উচ্ছ্বসিত আবেগে পিশি প্রশ্ন করে—আমার চিঠি এনেছ, বাবা?

ডাক-ওলা তার থলি না দেখেই বলে,—চিঠি নেই গো।

বেচারীর সমস্ত মন অমনি নির্জীব অচেতন হয়ে পড়ে। শরীরের সমস্ত বাঁধন যেন এলিয়ে আসে! সে ভাবে, আমি গরিব, আমার কেউ নেই,—তাই কোম্পানির লোক ডাকওলা আমাকে গ্রাহ্যিও করে না! চিঠি নিয়ে আসে না!

পাড়ার পাঁচজনকে তখন সে ধরে। তারা বলে,—এখনো চিঠির জবাব আসবার সময় আছে!

এখনো সময় আছে, সময় আছে তাহলে! আঃ!

আশায় আশায় দিনের পর দিন গিয়ে একটা মাসও যখন যায়-যায় হয়, তখন বেচারীর আর সোয়াস্তি থাকে না! আবার একজনকে ধরে বসে,—ওগো, ঠিকানাটা ভালো করে পষ্ট করে এবার একখানা চিঠি বেশ গুছিয়ে লিখে দাও না গা!

এমান আশা-নিরাশার মধ্যে দিয়েই বুড়ীর দিন কেটে যায়!

আজ যে-ছেলেটির কাছে সে চিঠি লেখাতে এসেছিল, সে ছেলেটির লেখা-পড়ায় বেশ নাম-ডাক বেরিয়েছে। তাই শুনে চিঠি লেখাবার পক্ষে সে খুব পাকা লোক হবে ভেবেই

বুড়ী তার বাড়ী এসেছিল, তাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে! ছেলেটির নাম, বিপিন।

বিপিন প্রথমেই 'কল্যাণবরেষু' পাঠ লিখে বুড়ীর মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে,—কি লিখব পিশিমা, বল?

বুড়ী বল্‌লে,—লেখো,—তুমি কেমন আছ? জামাই কেমন আছেন? বাড়ীর সকলে কেমন আছে? অনেকদিন কোন খপর পাইনি বলে আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। এবার যেন সে চিঠির জবাব দেয়। তারপর লেখো, আমি ভাল আছি। দুজনকে আশীর্ব্বাদ জানাও,—এই আর কি সব কথা।

বৃদ্ধা একটি-একটি করে কথা বলে যেতে লাগল—আর বিপিন তার ছাত্রবৃত্তি-পাশ-করা বিদ্যার বহরে সেই কথাগুলোকেই বাড়িয়ে তার উপর দু-পোঁছ রঙ্‌ দিয়ে লিখে চল্‌ল। পিশিমার যা লেখবার ছিল, সে সব কথা শেষ করে বিপিন বল্‌লে,—ঠিকানা কি লিখব?

—এই যে বাবা, ঠিকানা—বলে বৃদ্ধা আঁচলের খুঁট খুলে ভাঁজ-করা ময়লা একটা চিরকুট বার করলে। বিপিন সেটা দেখে ঠিকানা লিখলে।

বৃদ্ধা বল্‌লে,—মুড়ে ফেলছ যে! আর কিছু লিখবে না?

—আর ত জায়গা নেই।

বৃদ্ধার বুক কেঁপে উঠল। জায়গা নেই! আর জায়গা নেই!

কিন্তু লেখবার যে এখনো অনেক কথা ছিল—এরি মধ্যে জায়গা ফুরিয়ে গেল! কাল সারারাত যখন চোখে ঘুম আস্‌ছিল

না, তখন ফেলিকে কি লিখবে, সে সব কথা ভেবে ঠিক করে ফেলেছিল যে। সে যে অনেক কথা। চার বছরে খপর দেবার মত কত ঘটনাই গাঁয়ে ঘটে গেছে। নদীটায় চড়া পড়েছে, বোসেদের অত-বড় পুকুর ঝাঁজি হয়ে একেবারে সবরাব অযুগ্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেজন্যে জলের ভারী কষ্ট হচ্ছে। তবে' গে গাঁয়ের টেঁপি, পুঁটি, ভুতো, সারদা—এদের বিয়ে হয়ে গেছে—দাশুর ঠাকুমা মারা গেছে—ওদের নন্দর একটি ছেলে হয়েছে—এই সেদিন খুব শিল পড়ে দত্ত-পুকুরের অত যে মাছ সব মরে গেছে—এমনি কত কি ব্যাপার যে ঘটে গেছে। প্রত্যেক খপরটিরই যে দাম আছে! চার পাতা চিঠি লেখা হয়ে গেল, অথচ এতগুলো খপর,—সবই একেবারে বাকি রইল!

একটা নিশ্বাস ফেলে বুড়ী খামে-মোড়া চিঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর বিপিনকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করে বেচারী সেই চিঠি হাতে করে চলল, চার ক্রোশ দূরে সদরের ডাক-ঘরে, সে চিঠি ডাকে দিতে।

সহরের মধ্যে ছোট্ট ঝরঝরে পরিষ্কার বাড়ী। খাটের উপরে শুয়ে এক সুন্দরী কিশোরী একখানা উপন্যাস পড়ছিল—পাশে অয়েলক্লথ-পাতা ছোট বিছানায় একটি কচি ছেলে ঘুমুচ্ছিল। কিশোরী উপন্যাস পড়ছিল আর মাঝে মাঝে বুকে সে কি এক অসহ্য আবেগ নিয়ে চোখ তুলে কচি ছেলেটির পানে ফিরে-ফিরে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল!

হঠাৎ এক তরুণ যুবা ঘরে এসে বললে,—তোমার একটা চিঠি গো। বোধ হয় তোমার পিশিমা লিখেছেন।

কিশোরী উঠে চিঠি পড়তে লাগল। অক্ষরগুলো কার হাতের, জানা নেই—কিন্তু কথাগুলো পিশিমারই বটে! স্নেহের সেই শত কাকুতিতে ভরা, আবেগে অধীর—এ পিশিমারই চিঠি, বটে!

কিন্তু এ অনুযোগ ত ঠিক নয়। চিঠি কি সে লেখেনি?... না, লেখা হয় নি। আজ লেখা হল না, কাল লিখব'খন এই বলে ফেলে-ফেলেই রেখেছিল, লেখা আর হয়ে ওঠে নি। তাইত!...একটু দেরী হয়ে গেছে বটে। কিন্তু সে দেরী খালি সময়ের অভাবের জন্যেই না! সংসারের কাজ-কর্ম্ম আছে, চারধার দেখাশোনা, তারপর ঐ কচি ছেলের ঝাঁকি,—ঝঞ্ঝাট কি কম!

স্বামীকে সে বললে,—হ্যাঁগা, একদিন পিশিমার কাছে বেড়িয়ে এলে হয় না?

স্বামী বললে,—কি করে হয়? এই ছোট্ট ছেলে নিয়ে পাড়াগাঁয় যাওয়া—!

কিশোরীর মনে একটু ঘা লাগল। এই পাড়াগাঁয়ে ত তার জীবন কেটে গেছে! আর সে ভালোই কেটেছে! এই পাড়াগাঁয়েরই মেটে পথ, শ্যাওলা-পড়া পুকুর, শিউলি-তলা, ভাঙা মন্দির তার কত আনন্দের জিনিষ ছিল! আর আজ এই পাড়াগাঁয়ে তার ছেলের যাবার উপায় নেই! পঞ্চাশ রকমের নিষেধ মস্ত বেড়া তুলে দাঁড়িয়ে আছে!

আর পিশিমা! আহা, বেচারী! সংসারে সে-ছাড়া তার যে আর কেউ নেই! তাকে কোলে-পিঠে করে, তারই মুখ চেয়ে পিশিমা এই বাঁধন-হারা সংসারে একটা মস্ত বাঁধন

পেয়েছিল যে! সংসার আবার তার সামনে সহস্র প্রলোভন বিস্তার করেছিল। আজ পিশির আর কি আছে, কে আছে? কেউ না,—কিছু না।

সে ভাবলে, আজ দুপুর বেলায় সে পিশিমাকে চিঠি লিখবে—মস্ত চিঠি। খোকার কথা, নিজের কথা সব লিখবে। তা-ছাড়া পিশিমাকে একবার আসবার কথাও লিখবে! কেন পিশিমা আসবে না? জামাই-বাড়ী! উঃ,—ভারী ত বয়ে গেল তাতে! খোকাকে পিশি দেখবে না? আহা, খোকার আমার খপরও তাকে দেওয়া হয়-নি গো।

দুপুর বেলায় সে চিঠির কাগজ নিয়ে বসল, পিশিমাকে চিঠি লিখতে। আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে সে অনেক কথা ভাবতে লাগল। কি লিখবে, কি বলে কোন্ কথাটি দিয়ে চিঠি আরম্ভ করবে, মোলায়েম করে কি কি কথা লিখলে পিশিমার এই এত দিনের দীর্ঘ ব্যথা জুড়িয়ে দিতে পারবে,—ভেবে তার একটা নিশানা করে সে লিখলে,—

শ্রীচরণেষু—

স্বামী এসে সামনে দাঁড়াল, বললে,—কি করছ গা?

—চিঠি লিখছি।

—এখন চিঠি-লেখা থাক্। এসো, একটু বেড়িয়ে আসিগে। বরানগরে একটা বাগান ঠিক করা হয়েছে। আরো দু-তিনজন বন্ধু তাদের স্ত্রীদের নিয়ে যাবে, সেখানে চড়ি-ভাতি হবে। নৌকো অবধি ঠিক—নাও, উঠে পড়।

—চিঠিখানা লিখে নি গো,—একটু দাঁড়াও।

—না, না, ও ফিরে এসে লিখো'খন।

চিঠি আর লেখা হল না। ব্রাহ্ম ধরণে ঘুরিয়ে ভালো শাড়ী পরে তাতে ক্রচ এঁটে কিশোরী তখন স্বামীর হাত ধরে গিয়ে গাড়ীতে উঠল; গাড়ী করে ঘাটে এসে নৌকোয়—নৌকোয় করে একেবারে বরানগরে বাগানের ঘাটে আসা হল। বাসি, রেণু, তমাল, পরী সবাই এসেছে। কতদিন পরে সকলের সঙ্গে দেখা! আনন্দ সেখানে যেন একেবারে উছলে পড়ছিল।

সেই আনন্দের মধ্যে কিশোরী এসে আপনার মনটাকে ছেড়ে দিলে! এ আনন্দে কোথায় ভেসে গেল, পাড়াগাঁয়ের সেই অনাড়ম্বর ভাঙ্গা-চোরা বাড়ী-ঘরের ছোট্ট স্মৃতিটুকু! কোথায় ভেসে গেল, স্নেহময়ী পিশিমার ভাবনায়-আকুল চোখের সে ছল-ছল দৃষ্টিই বা।

সন্ধ্যার সময় সকলে যখন বাড়ী ফিরছিল, তখন অত আনন্দ-হাসি-গল্পের মধ্যে থেকে-থেকে একটা বেদনা কিশোরীর প্রাণে ভয়ানক বাজছিল!

বাড়ী ফিরে এসে দেখে, ছেলের গা গরম, পুড়ে যাচ্ছে! খুব জ্বর! কাজেই চিঠি আর সে-রাত্রে লেখা হল না!

দাগী

তখন আমার জুনিয়ারির পালা। সারাদিন কোর্টে ঘুরিয়া রৌদ্র ও ধূলা খাইয়া গৃহে ফিরি; প্রাণে বৈরাগ্যের বাসনাও দেখা দিয়াছে।

বেশ মনে পড়ে. সেদিন সকাল হইতে বাদলা সুরু হইয়াছে—পথে কাদা, আকাশে মেঘ, চারিদিকে বিষম নিরানন্দ ভাব,—হাতে কোন কাজ ছিল না। হাকিম সদানন্দ সেন একটা একশ'দশ ধারার মামলা করিতেছিলেন। একটু রস পাইবার আশায় তাঁর এজলাসে আসিয়া বসিলাম।

আসামী এক বাঙ্গালী যুবা—গায়ের রঙ তামার মত, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরণে ময়লা কাপড়, অঙ্গে একটা তালি দেওয়া ছিটের কামিজ। কাঠগড়ার রেলিঙে মাথার ভর রাখিয়া মুখ গুঁজিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল। পুলিশ হইতে প্রায় ত্রিশ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইতেছিল। কয়েকজন দোকানদার, কয়টা পতিতা নারী, দুই-চারিজন পানওয়ালা—সকলেই হলফ লইয়া সাক্ষ্য দিতেছিল, আসামী এক ভীষণ গুণ্ডা, কোন কাজ-কর্ম্ম করে না; যখন-তখন তাদের কাছে আসিয়া জুলুম করিয়া ভয় দেখাইয়া নেশা-ভাঙ করিবার পয়সা আদায় করে—বে-গোছ দেখিলে নাকি ছুরিও উঁচাইতে ছাড়ে না। প্রাণের ভয়ে সাক্ষীর দল কেহ চার আনা, কেহ সাত পয়সা, কেহ বা পাঁচ সিকাও কখনও কখনও তাহাকে দিয়া ফেলিয়া প্রাণে প্রাণে খুব

রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। এই পয়সা কেহ দিয়াছে, এক মাস পূর্ব্বে; কেহ বছর-খানেক কেহ-বা আবার দেড় বছর পূর্ব্বে। ইহার বিরুদ্ধে কোন দিন কেহ আদালতে নালিশ করে নাই বা পুলিশেও কোন ডায়েরী লেখায় নাই!

লোকটার চেহারা দেখিলে মনে হয়, সে চিররুগ্ন,—অত্যন্ত কৃশ দেহ, পেশীগুলা নিতান্তই ক্ষীণ, দুর্ব্বল। অথচ সে এমন জুলুম-জবরদস্ত করিয়া এই-সব ষণ্ডা জোয়ান দোকানদার আর ভীমমূর্ত্তি বারাঙ্গনাদের কাছ হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে,—শুনিয়া প্রাণে কেমন একটা বিস্ময়-কৌতূহলের সঞ্চার হইল।

একজন বন্ধু কহিলেন,—এসো না হে, এর হয়ে দাঁড়ানো যাক্!

আমি কহিলাম,—পয়সা দেবে কে?

বন্ধু কহিলেন,—কি এমন পাঁচশ' দশ রোজগার করা যাচ্ছে যে পয়সার দুঃখে মরে যাব! অমনিই একবার পরখ করি—এই ত রাবিশ সাক্ষী—

অপর বন্ধু কহিলেন,—বিনা-পয়সায় দাঁড়িয়ে লোকটাকে জেলে ঠেলব? পয়সা পেলে তবু নেমকহারামি পাপটা ঘটতো না!

আমি কহিলাম,—মন্দ নয়—শাস্ত্রেও আছে, শতমারী ভবেৎ বৈদ্য! তা এ নয় হবে আমাদের নাম্বার ওয়ান্।

হাকিমের অনুমতি চাহিলাম। তিনি বিরক্ত চিত্তে কহিলেন,—ওর আবার উকিল দেওয়া কি! পাঁচ বারের দাগী—

আমরা নাছোড়বন্দা—আসামীকে জনান্তিকে রাজী করাইয়াছিলাম; হাকিম অগত্যা অনুমতি দিলেন। আমরা

আসামীর জামিনটা একটু কমাইয়া দিতে বলিলাম। হাকিম বক্র দৃষ্টিতে সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। আমরা তখনি মোক্তার নারাণবাবুকে আনিয়া পয়সা ব্যয় করিয়া তাহার জামিন করাইয়া লইলাম।

পুলিশের দারোগা তখন কোর্ট বাবুকে কি-একখানা মোটা কাগজ দেখাইতেছিল। হাকিমের সেদিকে নজর পড়িল। হাকিম কহিলেন,—কি ওটা ?

দারোগা সসম্ভ্রমে সেটি হাকিমের হাতে দিয়া কহিল,—আসামীর কাছে সম্পত্তির মধ্যে এই ছবিখানা শুধু পাওয়া গেছে।

হাকিম ছবিখানার পানে চাহিয়া পরক্ষণেই আসামীর দিকে চাহিলেন। চোরের মত কুণ্ঠিত দৃষ্টি! মুখ তাঁর নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল—কপালে বেশ স্পষ্ট স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপনার খাস-কামরায় উঠিয়া গেলেন; কোনদিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না।

আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম। কি এমন ফটোগ্রাফ—কার ফটোগ্রাফ যে মুহূর্তে এ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি ?

ফটোখানা হাকিমের টেবিলে পড়িয়াছিল। কোর্ট বাবুর খোসামোদ করিয়া চাহিয়া লইলাম। এক স্ত্রীলোকের ফটো—সুন্দর! কুঞ্চিত সজ্জিত কৃষ্ণ কেশদামের মধ্যে অপরূপ সুন্দরী এক কিশোরীর মুখ! ছবিখানি অত্যন্ত পুরাতন—কালের নিশ্বাসে ঈষৎ অস্পষ্ট ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

পেস্কার, আমলা সকলেই কৌতূহলী হইয়া পড়িয়াছিল।

এমন কড়া হাকিম—সাজা দিতে অদ্বিতীয়—সে বিষয়ে বাপের খাতিরও যিনি রাখিতে জানেন না, এ ছবিতে হঠাৎ তাঁর এমন পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন?

সকলেই আসামীর পানে চাহিল—এ দিকে তার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জামিনের কাগজ সহি করিয়া নারাণ মোক্তারের সহিত এক কোণে বসিয়া সে তখন দিব্য গল্প জুড়িয়া দিয়াছে।

পরদিন সকালে আসামীকে ধরিয়া পড়িলাম, ও ছবি কার? বলিতে হইবে। আসামী প্রথমে কিছুতেই বলিতে চাহে না—শেষে বিস্তর পীড়াপীড়িতে কহিল, ও ছবি তার মৃতা জননীর।

তারপর সে আপনার জীবনের কাহিনী বলিল। তার নাম, মাখন।

মাখন বলিল,

—আমার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আমার মা মারা যান। বাবা পাগলের মত হইলেন। তিনি তখন এম-এ পড়িতেছেন; পরীক্ষা-পড়া সব ছাড়িয়া আমায় বুকে টানিয়াই বাহিরের ঘরে দিবারাত্র পড়িয়া থাকিতেন। আত্মীয়-বন্ধুর দল ঘাড়ে পড়িয়া তাঁর সে ভীষণ শোকাগ্নি নিবাইবার চেষ্টা জুড়িয়া দিল।

পুরুষ মানুষের শোক, তায় আবার স্ত্রী-বিয়োগের—সে মুছিতে বড় বিলম্ব হয় না—তবে ঠিক ঔষধটি দেওয়া চাই। সেই ঔষধেরই ব্যবস্থা হইল। বাবা আবার বিবাহ করিলেন। নূতন

মা এক বড় চাকুরের কন্যা। সমস্ত দুঃখ-বেদনা নিরানন্দ মুছিয়া তিনি একদিন আমাদের গৃহে সম্রাজ্ঞার আসন পাতিয়া বসিয়া গেলেন। বাবার মুখে আচরেক আবার হাসি দেখা দিল—মাত্রা যেন আগেকার চেয়েও বেশী!

আমি কিন্তু তাঁর পানে আর ঘেঁস দিলাম না। প্রথম হইতেই কি যে কুবুদ্ধি ঘটিল! নূতন মার উপর রাগ ধরিয়াছিল। নিজের মাকে হারাইয়াও একটা সান্ত্বনা ইহাই ছিল, বাবাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিয়াছি! এতখানি লাভে মা-হারাণোর লোকসানটা মনেও ওঠে নাই! কিন্তু নূতন মা বাবাকে আমার কাছ হইতে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন! আমার পানে ফিরিয়া চাহিবার অবকাশও বাবাকে তিনি দিতে পারিতেন না! আমার বেশ মনে পড়ে, মা তখন বাঁচিয়াছিলেন, দুপুরবেলা তিনি নিদ্রা গেলে আমি বাহিরের ঘরে জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতাম, দেখিতাম, ঠিক পথের অপর পাশে নিমগাছের তলায় একটু ছায়ার আড়াল পাইয়া একটা রুগ্ন কুকুর আসিয়া সেখানে পড়িয়া আছে—অত্যন্ত রুক্ষ মূর্ত্তি—নিতান্ত নিঃসহায়, বেচারা! বাবার এই পরিবর্ত্তনে আমার নিজের মনটা ঠিক সেই কুকুরটার মতই যেন এক অসীম বেদনার ঘা খাইয়া তেমনই নিঃসঙ্গ কুণ্ঠিতভাবে পড়িয়া থাকিত। অথচ উপায়ও ছিল না। একদিন জোর করিয়া বাবার আদর কাড়িতে গিয়াছিলাম—নূতন মা তাড়া দিলেন,—পড়া নেই, শোনা নেই, বুড়োধাড়ি ছেলে, খালি ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছেন!

দুঃখে আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু জোর করিয়া কান্না রোধ করিলাম— এই পাষাণীর কাছে চোখের জল ফেলিব?

না, কখনও না! বাবার পানে একবার চাহিলাম, বাবার মুখ নিরুপায় কুণ্ঠায় একেবারে যেন সাদা হইয়া গিয়াছে! গতিক বুঝিয়া আমি সে ঘর ত্যাগ করিলাম।

বাড়ীতে আত্মীয়ও যে কেহ না ছিল, এমন নয়। তবে সকলেই নিজেদের লইয়া ব্যস্ত। স্কুলে যাইতাম—ইংরাজী বইয়ে একটা গল্প পড়িয়াছিলাম—কি-একটা দেশের তখন অত্যন্ত অরাজক অবস্থা! যে যেমন করিয়া পারে, শুধু নিজেদের জিনিস-পত্র সামলাইতেই দারুণ ব্যস্ত, আশে-পাশে কত নিরাহ দুর্ব্বল অত্যাচারে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে, সেদিকে মন দিবার কাহারও অবসর নাই,— আমাদের বাড়ীর দশাটাও তখন ঠিক সেই রকম! মাথার উপর শক্ত অভিভাবক নাই,—বাবা বাড়ীর বড় ছেলে—অপরে জ্ঞাতিকুটুম্ব মাত্র, তারা উৎসব-আমোদের সময় দন্ত মেলিয়া সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে জানে, বিপদের লক্ষণ বুঝিলে নিমেষে কোথায় চম্পট দেয়!

এই ভাবেই ভাঙ্গা নৌকার মত জীবনটাকে যখন টানিয়া লইয়া ফিরিতেছি, তখন সহসা এক দমকা হাওয়া দেখা দিল। বাবা এম-এ ফেল করিয়া বসিলেন এবং তার দুই-চারি মাস বাদেই নূতন শ্বশুরের সুপারিশ ও জোগাড়ের জোরে একদিন হাকিম হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমাকেও বাবার সঙ্গে লইয়া যাইবার কথা ছিল—কিন্তু হঠাৎ যাত্রা-কালে নূতন মা বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিলেন, তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে না। কারণ, হাকিমি চাকরি লইয়া বাবাকে সাত ঘাটের জল খাইয়া ফিরিতে হইবে—আমি সঙ্গে থাকিলে আমার পড়াশুনার

বিষম ব্যাঘাত ঘটিবে এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটুকু একদম মাটি হইয়া যাইবে, তার উপর বিদেশ-বিভুঁই, সেখানকার জল-হাওয়া আমার ধাতে সহিবে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ত্রীলোকদের দূরদর্শিতা সম্বন্ধে সহসা বাবার অত্যন্ত আস্থা দেখা গেল। কাজেই তিনি মাসহরার আশা দিয়া আমাকে জ্ঞাতির দলে রাখিয়া গেলেন।

আমি কোন কথা কহিলাম না। আমার কেমন তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল, এ বিশ্ব-রঙ্গভূমে কোথায় কি অভিনয় চলিতেছে, আমার যেন শুধু তা দেখিবারই পালা! এ অভিনয়ে আমায় নামিতে হইবে না, আমার জন্য এখানে কোন ভূমিকাই যেন নির্দ্দিষ্ট নাই! স্থাণুর মতই অচপল চিত্তে আমি বাড়ীতে পড়িয়া রহিলাম।

মাখন বলিতে লাগিল,—দুই-তিন বৎসর এক রকমে কাটিয়া গেল। তারপর একদিন বড় কাকা বলিলেন,—বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে, তোমার বাবাই এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। আমরা নানান্ দিকে ছড়িয়ে পড়ছি—তোমার পক্ষে এখন তোমার বাবার কাছে যাওয়াই উচিত।

বড় কাকার কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না! সাধারণ দশ বৎসর বয়সের বাঙালীর ছেলেরা এ-সব বিষয় বড়-একটা বুঝিতে পারে না—কিন্তু মা-হারা ছেলে—বিশেষ আমার মত অবস্থায় পড়িলে বুদ্ধি তার একটু চট্ করিয়াই বাড়িয়া ওঠে!

সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। কেবলই ভাবিতে লাগিলাম,

কোথায় যাই? কি করি? একবার ভাবিলাম, বাবার কাছে যাই। বাবা তখন খুলনার ওদিকে কোথায় এক মহকুমার হাকিম। কিন্তু পরক্ষণেই বিমাতার সেই রোষ-রুদ্র মুখ ও কঠিন দৃষ্টির কথা মনে পড়িতে সে বাসনা কর্পূরের মত উবিয়া গেল! ভাবিলাম, সেখানে যাওয়ার চেয়ে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানোতেও ঢের আরাম, ঢের সুখ! ঘরের দেওয়ালে মার একখান ফ্রেমে আঁটা ছবি টাঙ্গানো ছিল। সারা রাত্রি প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোয় সেখানার পানে চাহিয়াই চোখের জল ফেলিলাম; মার শোক সে রাত্রে নূতন করিয়া বুকে বাজিল। শেষে সেই ছবিখানাকে মাত্র সম্বল করিয়া পরণের দুই-চারখানা কাপড় লইয়া ভোরের দিকে বাড়ী ছাড়িলাম।

সম্মুখে দীর্ঘ পথ পড়িয়া আছে। দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত সেই পথে চলিতে সুরু করিলাম। মাথার উপর তরুণ স্নিগ্ধ সূর্য্য ক্রমে রুদ্র মূর্ত্তিতে [illegible] তাঁর তেজ দেখা দিল। সেদিকে দৃক্পাতমাত্র না করিয়া আমি চলিতে লাগিলাম—সূর্য্য হার মানিয়া শেষে আবার শান্ত শীতল মূর্ত্তি ধরিয়া মৃদু হাসিয়া দিগন্তের কোলে ঢলিয়া পড়িল, তবুও আমি চলিতেছি! হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে, দারুণ পিপাসায় গলার মধ্যে যেন ছুঁচ ফুটিতেছে, অসহ্য বেদনা বোধ হইতেছে! কিন্তু কোথায় বসিব? আমার যে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তিলার্দ্ধ স্থান নাই!

যাক্, সে পথের কষ্ট আর খুলিয়া বলিয়া কাজ নাই। শেষে আশ্রয় মিলিল। এক গৃহস্থের বাড়ী বাসন-মাজার কাজে লাগিয়া গেলাম। চার বৎসর কাজ করিলাম। মন্দ লাগিত না, আরামও

পাইতাম। এক একবার মনে হইত, আমার বাপ হাকিম, আর আমি! তখনই হাসি আসিত। কিন্তু একদিনের জন্যও ক্ষোভ জাগে নাই।

আমার নিশ্বাসে বুঝি কি বিষ ছিল! নহিলে বাড়ীর কর্ত্তা একদিন গ্রামান্তর হইতে জ্বর গায়ে বাড়ী ফিরিয়া যে-বিছানা লইলেন, সে-বিছানা আর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় না কেন? মৃত্যু তাঁকে আপনার কোলে টানিয়া লইল। পাখীর বাসায় ঢিল ছুড়িলে মুহূর্ত্তে যেমন তা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, মানবের গৃহের দশা ঠিক তেমনি ঘটিল। আমি আবার পথে বাহির হইলাম। বাবা তখন কটকে,—আমার এক ভায়ের জন্মোৎসবের ধূমে আত্মহারা!

তার পর এই শহর কলিকাতায় আসিলাম। এ এক মজার দেশ! যারা এখানে সুখী, যারা বড় লোক, তারা কারও পানে ফিরিয়া না চাহিলেও দুঃখী-গরীবের দল সাধিয়া কথা কয়, ডাকিয়া দুই মুঠা খাইতেও দেয়। এক ঠাকুর বাড়ীতে আস্তানা মিলিল। কিছুদিন সেখানে পূজারীর মন যোগাইয়া কাটাইয়া দিলাম; কিন্তু টিঁকিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোথা হইতে যেন এক অদৃশ্য রজ্জু কোন্ এক অজানা পথে আমায় টানিতেছিল! তিন-চার বৎসর এখানে-ওখানে ঘুরিয়া একটা হোটেলে চাকরি করিতে আসিলাম। সেখানে বিশ্বের যত বিদ্বেষ, কলহ, নীচতা, স্বার্থ এক বিপুল ষড়যন্ত্র পাকাইয়া বসিয়া আছে, হিংসার জোট বিছানো আছে—তাহাতে পা বাধিল। সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া একেবারে আদালতের দ্বারে গড়াইয়া পড়িলাম।

হোটেলের কর্ত্তার এক প্রৌঢ়া প্রণয়িনী ছিল—আমার উপর না কি তার একটু অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল ! নেপথ্যেই ইহার ইঙ্গিতাভিনয় চলিতেছিল, তার আভাসমাত্রও আমার পাইবার সুযোগ ঘটে নাই—ইতিমধ্যেই কর্ত্তার মনে কেমন করিয়া সন্দেহ হয়—সে একেবারে থালা-ঘটি-সমেত চুরির চার্জ্জ দিয়া আমাকে পুলিশের হাতে তুলিয়া দিল। আমি কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম। ব্যাপারখানা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই হাকিমের রায় বাহির হইয়া গেল—তিন মাসের জন্য আমার জেলের ব্যবস্থা।

জেলের গাড়ীতে বসিয়া সত্যই সেদিন প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছিলাম—বাঃ, আশ্রয়হীন আমি, আজ এখানে, কাল সেখানে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম, ভগবান আজ আমায় দিব্য আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন ত! আর অন্নের ভাবনা ভাবিতে হইবে না, পড়িয়া ঘুমাইবার জন্য ছাদ-ঢাকা একটু ঠাঁইও অনায়াসে মিলিবে!

তিন মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। ভিক্ষা মাগিয়া দিন কাটিত। একদিন রাত্রে বাজারে যাত্রা হইতেছে শুনিয়া সেই দিকে চলিলাম। পথে পাহারাওয়ালা পাকড়াও করিয়া থানায় চালান দিল। কাজ-কর্ম্ম নাই বলিয়া হাকিম ছ'মাসের জামিন চাহিয়া বসিলেন। কে আমার জামিন হইবে? ছ'মাসের জন্য আবার জেলে চলিলাম।

ছ'মাস পরে জেল হইতে ফিরিয়া আসিলাম। একটা মন্দিরের রোয়াকে পড়িয়া থাকিতাম। পূজারীর সহিত একটা যাত্রীর ঝগড়া বাধিল। পূজারী যাত্রীর বোচ্‌কা সরাইয়া রাখিয়াছিল। পুলিশ আসিতে দেখি, বোচকাটা আমার

কাছে! আমি ঘুমাইতেছিলাম। গুঁতা মারিয়া পুলিশ ঘুম ভাঙাইয়া বোচ্‌কা দেখাইয়া বলিল,—ব্যাটা চোর, চল্‌ থানায়।

আমি অবাক! আবার জেলে চলিলাম।

এবার জেলে বসিয়া স্থির করিলাম, এই পথই ভাল। বাহিরে যখন নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই,—কাজ করিতে গেলে লোকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে, কাজের চেষ্টায় পথে বাহির হইলে হাকিম সদর্পে জামিন চাহিবে—তার চেয়ে জেলে থাকিলে বাঁধাবাঁধির আর ভয় থাকিবে না, রুলের গুঁতা হইতেও রক্ষা পাইব!

এবার জেল হইতে ফিরিলাম,—অদৃষ্ট প্রসন্ন মূর্ত্তিতে অভ্যর্থনা করিল। এক বড়লোকের কাছে চাকরি মিলিল। জেলেই এক বন্ধু জুটিয়াছিল—আমারই সমবয়সী। সে তার মনিবের খুব সুখ্যাতি করিত। তার মনিব ইসুফ কোকেন-ওয়ালা। সে তার অধীনে থাকিয়া কোকেন বেচিত। মনিবের যত্নের ত্রুটি নাই। কোকেন বেচার আশঙ্কা খুবই, অথচ লাভেরও সীমা নাই। ধরা পড়িলে মনিব বেশ মোটা টাকা ব্যয় করিয়া বড় উকিল লাগাইয়া বাঁচাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করে। বরাতে যদি জেল ঘটে, ঘটুক —ফিরিয়া কিন্তু মনিবের কাছে রীতিমত বখশিস্‌ মেলে!

সেই চাকরিই লইলাম। দুঃসাহসের কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধু ঠিক বলিয়াছিল, লাভ ইহাতে বিলক্ষণ! এই কোকেন লইয়া আরও দুইবার জেল খাটিয়া আসিলাম।

শেষবারে ফিরিয়া কিন্তু পুনর্মূষিক! কোকেন-ওয়ালা মনিব এক খুনী মামলার আসামী হইয়া বিচারে দ্বীপান্তরে চালান হইয়া গিয়াছে। আমি চারিধার অন্ধকার দেখিলাম। হাতে টাকা ছিল

না। কোনমতে কিছু জোগাড় করিয়া একবার ভদ্রলোক সাজিয়া বাবার সহিত দেখা করিব, ভাবিলাম। তার পর একবার এমন একটা কার্ত্তির কাজ করিব, যাতে দেশের বুকে আমার নাম চিরকালের জন্য খোদা থাকে বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়।

একটা দল জড়ো করিলাম। বারো উল্টাডাঙ্গির বিখ্যাত মহাজন ঘনশ্যাম সাধুখাঁর তহবিল চলিয়াছিল, লোকের মাথায়। তাদের ঘাড়ে পড়িয়া সেই তহবিলে চোট দিলাম। বেশ মোটা টাকা হাতে আসিল।

নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার অবসর মিলিল না, পুলিশ আসিয়া গ্রেপ্তার করিল এবং হাকিমের কাছে চালান দিল। এ হাকিম বড় কড়া—ভাল লোক বলিয়া নাম-ডাক আছে আমার পূর্ব্ব-শাস্তির খবর দেখিয়া একেবারে দেড় বৎসরের জন্য জেলে আমার নিরাপদ বাড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তার পরই এই উৎপাত! এবার কিন্তু এ সবই বাস্তবিক ব্যাপার! দেড়মাস জেল হইতে ফিরিয়াছি—শরীর ত এই—দেহে বল নাই—মনে স্ফূর্ত্তি নাই। মার ছাই লইয়া একেবারে দেশে গিয়া সেই শ্মশানে পড়িয়া সব শেষ করিব ভাবিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু গোলযোগ ঘটিল। রাস্তার মোড়ে এক থার্ড ক্লাশ গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। এক জমাদার আসিয়া গাড়োয়ানের উপর তম্বি করে! গাড়োয়ান বেচারা সন্ত্রস্ত। আমি গায়ে পড়িয়া তার পক্ষ লইলাম। জমাদারের কোপ পড়িল আমার উপর—তার এক জুড়িদার নিমেষে কোথা হইতে আসিয়া আমায় সনাক্ত করিল, এ ব্যাটা পুরানো দাগী। জমাদার আমায় ধরিয়া থানায় আনিল। দুই দিন কোমরে দড়ি

বাঁধিয়া ঘুরাইয়া এই একশ' দশ ধারায় শেষে চালান দিয়াছে। সাক্ষীগুলা কোথা হইতে যে আসিল কিছুই জানি না। আমি উহাদের কখনো চক্ষেও দেখি নাই। যে পাড়ার লোক উহারা, সে পাড়ার পথেও কোনদিন হাঁটি নাই। অথচ উহারা সকলেই হলফ লইয়া সটান জুলুম-জবরদস্তির কথা বলিয়া গেল।

মাখন চুপ করিল।

আমি কহিলাম,—তোমার বাবার নাম কি? তিনি এখনও বেঁচে আছেন?

মাখন বলিল,—সে খপরে কি হবে, বাবু?

আমি কহিলাম,—হাকিমের কাছে প্রকাশ করে বললে সুবিচার প্রত্যাশা করতে পারি।

মাখনের চোখ-দুইটা সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল, বজ্রস্বরে সে কহিল,—কি বললেন? সুবিচার! ঐ হাকিমের কাছে? অসম্ভব! যদি সে আশা থাকত, তাহলে আজ এজলাসে ওর ঠাঁই না হয়ে আমার পাশে ঐ আসামীর কাঠগড়ায় ওকে দাঁড়াতে দেখতুম। আমার এ দুর্দ্দশার জন্যে কে দায়ী? আমি, না, ও? যদি ভগবান থাকেন, তিনি এর বিচার করবেন! হাকিম হয়ে বসে লোকের বিচার করচেন উনি? মাখন ফুঁসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম,---যাক্ ও কথা। তোমার বাপের নামটা বলই না। কিছু উপায় হবেই—

—কিসের উপায়? কোন উপায় করতে হবে না, বাবু। যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন! ও কি করবে আমার? জেলে দেবে? দিক্—ভগবান সব লিখে রাখচেন! ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে যদি ওঁর পৌরুষ হয়, হোক—

আমি কহিলাম,—এ আবার কি বকতে সুরু করলে, মাখন ?

—তবু বুঝতে পারছেন না, বাবু ? ওই ত আমার বাপ, ঐ সদানন্দ সেন—আপনাদের হাকিম—

আমি চমকিয়া উঠিলাম। হাকিম সদানন্দ সেন! সেদিন ছবি দেখিয়া হাকিমের সে চিত্ত-বিকারের কথা অমনি আমার মনে পড়িল। ব্যাপারটা জলের মত সাফ হইয়া গেল! আমি মাখনের পানে চাহিলাম। তার চোখ দিয়া তখনও যেন আগুন বাহির হইতেছে!

নিশীথে

গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া একটা আকুল আর্ত্তনাদ উঠিল,—আগুন লেগেছে! আগুন!

সুপ্ত নর-নারী চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। কোথায় আগুন? আশঙ্কায় তাহাদের বুক কাঁপিতেছিল, মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি জানলার পানে সকলে ছুটিয়া আসিল। ঐ দূরে অগ্নির লেলিহান শিখা গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে—চারিধার কে যেন লাল রঙে রাঙাইয়া তুলিয়াছে! যেন নিশীথিনীর কমনীয় কোমল কণ্ঠে কে তীক্ষ্ণ ছুরি বসাইয়া দিয়াছে—নিশীথিনীর কণ্ঠ ছিঁড়িয়া উষ্ণ লোহিত রক্তধারা উৎসের মত ঝরিয়া পড়িয়াছে!

উন্মাদের মত ব্যগ্র লোকজন আগুন লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিল।

সহরের প্রান্তে গরিবদের বস্তি—দীন-দুঃখীর মাথা গুঁজিবার আশ্রয়, খড়ে ছাওয়া জীর্ণ পাতার ঘর! তাহারই উপর হুতাশনের রোষ-দৃষ্টি পড়িয়াছে! রক্ষা নাই—রক্ষা নাই! এ রুদ্র রোষানল থামাইবার এতটুকু সামর্থ্য সে জীর্ণ পাতার ঘরের শীর্ণ কঙ্কালের কোথাও নাই, কোথাও নাই!

সারা দিন ধরিয়া গরিবের দল, ধনীর চলিবার পথ হইতে কাঁটা বাছিয়া তুলিতে গিয়া দেহের রক্ত পাত করিয়া আসিয়াছে, বিলাসীর সজ্জিত ভবনে সম্ভোগের উপকরণ সাজাইয়া এক মুঠা অন্নের জোগাড় করিয়া ফিরিয়াছে। এখন প্রসন্ন চিত্তে স্ত্রী-

পুত্রের মধুর সঙ্গ-লাভে বেচারা দিনের শ্রান্তি ভুলিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। তাহাদের এ নিশ্চিন্ত নিদ্রা-সুখ নিষ্ঠুর ভাগ্য-দেবতার সহ্য হইল না,—তাই তাঁহার উষ্ণ নিশ্বাসে আজ উপায়হীন বান্ধবহীন দরিদ্রদের সর্ব্বস্ব বুঝি-বা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়!

মা ছেলেকে কোলে তুলিয়া স্বামী স্ত্রীকে বুকে ধরিয়া পাগলের মত ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিল। মৃত্যুর দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে—ওরে, কে কোথায় আছিস্, আয়, আয়, মৃত্যু কোল পাতিয়াছে, ছুটিয়া আয়! নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বক্ষণে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছিল, মৃত্যুকে এখন সম্মুখে দেখিয়া তাহার কাছ হইতে দূরে পলাইবার জন্য সেও অপার আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়াছে!

পাশাপাশি অসংখ্য ঘর। সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বেদনার রঙ্গভূমি এই অসংখ্য ঘরে মুহূর্ত্তে একটা চাঞ্চল্য সাড়া দিয়া উঠিল। ভয়ের একটা নিকষ-কৃষ্ণ শিখা ঘরগুলাকে বেড়াজালের মতই ঘিরিয়া দিয়া গেল।

একটি ঘরে রুগ্ন স্বামী দুর্ব্বল দেহে পড়িয়া ছিল। স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বাহ্নে তার বিষম কলহ হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীকে অকথ্য গালি দিয়া স্বামী তাড়াইয়া দিয়াছিল। স্ত্রীও সতেজে স্বামীর মুখের উপর বলিয়া গিয়াছিল,—এই চল্লুম, যদি আর কখনও ফিরি—স্ত্রী একটা উৎকট শপথ করিয়া বিদায় লইয়াছিল।

এখন পথে দাঁড়াইয়া স্ত্রী আগুনের পানে চাহিয়াছিল। চোখে পলক নাই। পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতই তাহার দুই চোখ! বুকের মধ্যে রুদ্ধ অভিমান হিংসার আবরণ পরিয়া

সাপের মত ফুঁসিতেছিল। আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এক জায়গা হইতে অপর জায়গায় লাফাইয়া ছুটিয়াছে। সে যেন এক ভৈরবের উন্মাদ নৃত্য! প্রলয়ঙ্করী কপালিনীর তীক্ষ্ণ খর্পর যেন নিশীথের গাঢ় অন্ধকার কাটিয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! সহসা নারীর আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। উন্মাদের মত ছুটিয়া সে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া কৌতূহলী দর্শকের দল তামাসা দেখিতেছিল। এই আগুনের মুখে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য! নারীকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চোখ তাহাদের ঠিক্‌রিয়া পড়িবার মত হইল, সকলে কলরব করিয়া উঠিল! কলরব করা ছাড়া আর উপায়ও ছিল না! দগ্ধ বংশখণ্ড ফট্ ফট্ করিয়া ফাটিয়া বাজির মত আকাশে লাফাইয়া উঠিতেছে। অগ্নির সাগর,—চারিধারে অনলের তরঙ্গ ছুটিয়াছে! ব্রহ্মার আজ ক্ষুধা জাগিয়াছে! যতক্ষণ না সে ক্ষুধার পরিতোষ হয়, ততক্ষণ আর মুক্তি নাই, মুক্তি নাই, কাহারও মুক্তি নাই!

সহসা দূরে ঢঙ-ঢঙ ঢঙ-ঢঙ করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ঐ যে দমকল—দমকল আসিতেছে! আঃ, বাঁচা গেল! এতক্ষণে দর্শকের দল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! মুক্তির আরাম ঐ গাড়ীখানার পিঠে চড়িয়া এতক্ষণে আসিয়া দেখা দিয়াছে!

গাড়ী আসিয়া পড়িল। নল চালাইয়া জল ছড়াইয়া আগুন নিবাইবার উদ্যোগে সকলে লাগিয়া গেল। মুখে কাহারও কথা নাই। হাত-পাগুলা কলের মতই ক্ষিপ্র সহজ গতিতে কাজ সারিয়া যাইতেছে!

কিছুক্ষণ পরে ধরাধরি করিয়া সকলে একটা জলন্ত পদার্থ বাহিরে লইয়া আসিল। দর্শকের দল ঠোঁট বাঁকাইয়া বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল, গাঢ় আলিঙ্গন-বদ্ধ দুইটী প্রাণী। একটি পুরুষ, অপরটি নারী। দর্শকেরা শিহরিয়া উঠিল। এ সেই নারী—উন্মাদের মত এই কিছুক্ষণ-পূর্ব্বে যে ঐ আগুনের মুখে ছুটিয়া গিয়াছিল! এই কতক্ষণ-পূর্ব্বে যে শপথ করিয়া স্বামীর কাছে চির-বিদায় লইয়া আসিয়াছিল, স্বেচ্ছায় সে অনল-সাগরে ঝাঁপ দিয়া রুগ্ন স্বামীকে বাঁচাইতে আসিয়াছিল—না পারিয়া শেষে স্বামীর সহিত সহমরণে গিয়াছে।

আগুন নিবিয়া গিয়াছে। দেখিবার আর কিছুই নাই। দর্শকের দলও নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া আরাম পাইয়া বাঁচিয়াছে! দমকল চলিয়া গিয়াছে। এখনও দূর হইতে তাহার ঘণ্টাধ্বনি অস্পষ্ট আসিয়া কানে লাগিতেছে। দগ্ধ ভস্মস্তূপ রাত্রির কালিমাকে আরও ঘন করিয়া তুলিয়াছে! এবং সেই কৃষ্ণ ভস্মস্তূপের সুমুখে আশ্রয়হীন উপায়হীন নরনারীর দল পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক বসিয়া আছে! তাহারা গৃহহীন, রিক্ত, সর্ব্ব-হারা! এত দুঃখে কাঁদিতে কাহারও চোখে এক ফোঁটা জল অবধি নাই! সে জলটুকু আগুনের আঁচে শুকাইয়া গিয়াছে! জড়পিণ্ডের মতই মৌন মূক সকলে তাল পাকাইয়া বসিয়া ছিল! সব তাহাদের ফুরাইয়া গিয়াছে—কাল যে আবার রাত্রি পোহাইয়া দিনের আলো দেখা দিবে, সে সম্ভাবনার কথাও কাহারও মনে ছিল না! তাহারা শুধু ভাবিতেছিল, এত কোলাহল, এত লোকজন, আলো ও কোলাহলের

এমন সমারোহ এইমাত্র যেথানে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্ত্তের অবসরে মৃত্যুর এক সঘন নিবিড় স্তব্ধতায় সে-সব কোথায় চাপা পড়িয়া গেল।

যেন একটা স্বপ্ন চকিতে সকলকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে! লোক-জন, ছুটাছুটি, গোলমাল—সে যেন জোয়ারের জল—উচ্ছ্বসিত নদীবক্ষ ছাপাইয়া তীরে আসিয়া উঠিয়াছিল, এখন কৌতূহল-পরিতৃপ্তির অবসানে ভাঁটার টান ধরিয়াছে। সে উচ্ছ্বসিত জলরাশি কোথায় সরিয়া গিয়াছে, আর তাহারা জলে-ভাসা কাঠি-কুটাগুলার মতই তীরে আপনাদের কুৎসিত দৈন্যের মূর্ত্তি লইয়া পড়িয়া আছে—জল তাহাদের লইয়া যায় নাই, ধরণীর আবর্জ্জনা বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে!

ফেল্-জামিন

আমি ক্যাম্বেলের পাশ নেটিভ ডাক্তার। সাত ঘাটের জল খাইয়া সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি জেলে বদলি হইয়াছি।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বাসার সম্মুখে একটু খোলা জায়গা ছিল; সেইখানে ইজিচেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, এমন সময় একটা ওয়ার্ডার ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, জেলে এক 'অ্যাক্সিডেণ্ট কেশ' হইয়াছে। উমেশ কয়েদী পাথর-ভাঙ্গা মুগুর নিজের মাথায় মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। এখনই আমাকে যাইতে হইবে! ডাক্তার সাহেবের কাছেও লোক ছুটিয়াছে।

তাড়াতাড়ি জেলে ছুটিলাম। আমার বাসা হইতে জেল দশ মিনিটের পথ।

জেলে গিয়া দেখি, লোকটা বেহুঁস হইয়া রহিয়াছে। কপাল ছেঁচিয়া গিয়াছে! রক্তারক্তি ব্যাপার! একটু আশ্বস্ত হইলাম—মাথাটা একেবারে ভাঙ্গে নাই! তখন প্রয়োজন-মত ঔষধ-ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিলাম। নাড়ী টিপিলাম, ঠিক আছে। ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেবও আসিয়া পড়িলেন। ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া রিপোর্ট লিখিতে বলিয়া তিনি ক্লাবে চলিয়া গেলেন।

ইহার চার-পাঁচ দিন পরে—ঠিক তখন ভোর হইয়াছে,—সারারাত্রি ধরিয়া চীৎকার করিয়া জ্বালাইয়া ছোট ছেলেটা সবেমাত্র

ঘুমাইয়া ঘুমাইবার একটু অবকাশ দিয়াছে—আমিও ঘড়ির পানে চাহিয়া চক্ষু মুদিবার কল্পনা করিতেছি, এমন সময় ওয়ার্ডার আসিয়া বহির্দ্বারে উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল,—বাবু—

ভাল উৎপাত। বিরক্ত চিত্তে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। ওয়ার্ডার সেলাম করিয়া জানাইল, সেই উমেশ কয়েদী শেষরাত্রি হইতে বিষম বায়না ধরিয়াছে, ডাক্তার বাবুকে একবার ডাকিয়া দাও। কিছুতেই তাহাকে থামানো যাইতেছে না। বকিয়া বুঝাইয়া সকলে হার মানিয়া গিয়াছে! তাই শেষে—

লোকটার সবে জ্বর ছাড়িয়াছে। কাল রাত্রেও তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি, অনেকটা ভালই আছে! আবার পাছে কোন উৎপাত বাধাইয়া তোলে,—কাজেই জামাটা গায়ে দিয়া জেলে চলিলাম।

উমেশের বিছানার পাশে আসিয়া দেখি, বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া আছে। গায়ে হাত দিলাম, জ্বর নাই। উমেশ ফিরিয়া চাহিল, চোখ দুইটা ফুলিয়া উঠিয়াছে, বুঝিলাম, সে খুব কাঁদিয়াছে। আমি কহিলাম, কি হয়েছে উমেশ? ডাকছিলে কেন?

উমেশের চোখে জল দেখা দিল। ফুঁপাইয়া সে কহিল, —বাবু, কেন আমায় বাঁচালেন? আজ ক'দিন এ মনের মধ্যে যে কি আগুন জ্বলছে, তা যদি বুঝতেন!

ভাবিলাম, লোকটার অনুতাপ হইয়াছে! সে কহিল,—মরণ ত কিছুতেই দেখা দেয় না, কতদিন জ্বলব, তাও জানি না। সব তাই আমি শেষ করে দিতে গেছলুম, কিন্তু ধরে বেঁধে আবার টেনে তুললেন, কেন? মাথা জোড়া দিয়ে কি করবেন? মনটাকে আমার ঠিক করে দিতে পারবেন না ত।

তাহাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে দুই-চারিটা হিত-কথা পাড়িলাম; কিন্তু উমেশ কহিল, ও-সবে কোন ফল নাই! যে গাছের শিকড় কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে জল ঢালা আর কেন?

আমি তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। উমেশ কহিল,—এ সহরে আমার পানে কেউ ফিরে চায়নি, শুধু আপনি চেয়েছেন। আপনার প্রাণেই একটু মায়া আছে, দেখছি। আপনাকে সব কথা খুলে বলছি, শুনুন। শুনে বলুন, এত কাণ্ডের পর যদি কেউ মরতে চায় ত তাতে বাধা দিতে আছে কি না!

সে তখন আপনার জীবনের কাহিনী বলিতে সুরু করিল।

উমেশ বলিল,—সে আজ তিনি বৎসরের কথা। রাণীগঞ্জের হাটে গিয়াছিলাম, গরু কিনিতে। আমার বাড়ী জিয়ালিতে। দামোদরের উপরেই জিয়ালি,—ছোট্ট গ্রাম।

গরু কিনিয়া ফিরিবার পথে এক মুদির দোকানে বিশ্রাম করিতেছিলাম। সেখানে এক লোকের মুখে শুনিলাম, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান ভাসিয়া গিয়াছে। এমন জল সে তল্লাটে কোনকালে কেহ চক্ষে দেখে নাই। লোকের ঘর-বাড়ী, গরু-বাছুর সে জলের স্রোতে কোথায় সব ভাসিয়া গিয়াছে।

শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল।—আমার জিয়ালি? লোকটা কহিল, জিয়ালির কোন চিহ্নই নাই! বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া সে এক সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে! কাটা ছাগলের মতই প্রাণটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল! জিয়ালি গিয়াছে? তার মানে,—আমার সব গিয়াছে! ঘরে রুগ্না স্ত্রী, আদরের মেয়ে দুলালী, ক্ষেত-খামার, গরু-বাছুর,—সব—সব গিয়াছে! কিছুই আর নাই!

দোকানীর ঘরে গরু ফেলিয়া ছুটিয়া পথে বাহির হইলাম। পেটে কয়দিন অন্ন পড়ে নাই, ক্ষুধায় নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইতেছিল—তবুও সাত-আট ঘণ্টা পুরা দমে চলিয়া বর্দ্ধমানের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম! তার পরই মেঠো পথ জলের তলায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! যে-ধারে চাই, কেবল জল! বড় মাঠ বিলের আকার ধারণ করিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে-মধ্যে দুই চারিটা বড় বড় গাছ স্তব্ধ প্রহরীর মত মাথা তুলিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছিল,—তাহার সে লাল আলো জলে যেন সিঁদুর গুলিয়া দিয়াছে!

আমার চোখের সম্মুখে সে লাল জল রক্তনদীর মতই টক্‌টক্ করিতেছিল। পথ নাই, পথ নাই—চারিদিকে কেবলই জল! উপায় কি! মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল। সাঁতরাইয়া গৃহে ফিরিব ভাবিয়া জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ফাঁড়ির এক চৌকিদার আমায় চাপিয়া ধরিয়া ফেলিল। আমি কাঁদিয়া মিনতি করিলাম, ছাড়িয়া দাওগো,—আমার সব যায়।

সে কহিল, তাহার ছাড়িবার হুকুম নাই। পাছে কেহ জলে নামে, তাই রোধ করিবার জন্য সেখানে সে মোতায়েন আছে। আমায় ছাড়িয়া গাফিলির দণ্ডস্বরূপ দশটাকার চাকরি সে খোয়াইতে পারে না! চাকুরির উপরই তাহার জান-বাচ্ছার নির্ভর। বেশী জিদ ধরিলে আমায় সে থানার জিম্মা করিয়া দিবে, এমন ভয়ও দেখাইতে ছাড়িল না। আমি কেমন হতভম্বের মত বসিয়া পড়িলাম। চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী আঁধারে ভরিয়া গেল।

উমেশ বলিতে লাগিল,—কতক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া ছিলাম,

জানি না—চোখের সাম্‌নে মাথার উপর দিয়াই আঁধার রাত্রি পোহাইয়া গেল—আবার সূর্য্য উঠিল। সূর্য্যের তাপ গায়ে লাগায় আমার হুঁস হইল। তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমি অন্য পথে চলিলাম। চৌকিদার বাধা দিল না।

তারপর কোনমতে কোনখানে হাঁটু-ভোর জল ভাঙ্গিয়া, কোনখানে বা সাঁতরাইয়া গ্রামে ফিরিলাম। কিন্তু কোথায় গ্রাম! কোথায় ঘর! কোথায় স্ত্রী! কোথাই বা মেয়ে! দামোদর এক-নিশ্বাসে সমস্তই গ্রাস করিয়াছে। মাথার মধ্যে ঝিম্‌-ঝিম্‌ করিতে লাগিল। আমি শুইয়া পড়িলাম! ঘুমে চোখ ছাইয়া গেল!

যখন চোখ মেলিলাম, তখন দেখি, এক কানাতের ঘরে শুইয়া আছি। পাশে একটি বাবু বসিয়া আছেন। প্রথমটা কিছু খেয়াল হইল না। কিন্তু পাশ ফিরিতেই একটা নিশ্বাস পড়িল। অমনি মেঘের মত কালো স্মৃতি মনের উপর ঘনাইয়া আসিল। চোখে জল ঝরিল।

বাবুদের চেষ্টায় মেয়ে মিলিল—স্ত্রীকে পাওয়া গেল না। মেয়ে আসিয়া আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কাঁদিয়া কহিল,—বাবা, মা?

তেরো বছরের মেয়ে—তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! বুঝাইবই বা কি করিয়া—! তাহাকে বুকে চাপিতে চোখের জলে বুক ভরিয়া গেল। সাজানো ঘর, সাজানো সংসার দেখিয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম—ফিরিয়া দেখি, ভোজবাজির মতই সব কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! জীবনে দুঃস্বপ্ন মানুষ অনেক দেখে,—কিন্তু এ সত্য যে সে স্বপ্নেরও অগোচর!

ভাবিলাম, স্ত্রী যে পথে গিয়াছে, দুলালীকে বুকে করিয়া সেই পথেরই পথিক হই! সব যদি গেল ত এ গুঁড়াটুকুকে লইয়াই বা কোথায় রহিব! চোখের একটি পলক-পাতমাত্র—এ গুঁড়াটুকু উবিতে কতক্ষণ!

বাবুরা বুঝি মনটাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন! তাঁহারা কহিলেন, মেয়ের মুখ চাহিয়া আবার আমায় গা ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে। গলা টিপিয়া ত ইহাকে মারিতে পারি না! মেয়ের পানে চাহিলাম, তাহার চোখের কোণে জলের দাগ তখনও মিলাইয়া যায় নাই। সেই ঝাপ্‌সা জল-ভরা দৃষ্টিতে কি যে মমতা মাখানো ছিল! মরা হইল না। তাহাকে হাতে করিয়া মারা—না, সে আরও অসম্ভব!

কিন্তু কি দিয়া বাঁচাইব? ঘর নাই, অন্ন নাই—ধূ-ধূ প্রান্তরে কি দিয়া আবার ঘর বাঁধিব? কি খাইয়া বাঁচিব? এ বয়সে নূতন করিয়া সংগ্রহেরও আর সামর্থ্য নাই! তাহার উপর ডাগর মেয়ে, আজ বাদে কাল বিবাহ দিতে হইবে। পাহাড়ের মত দুর্ভাবনার ভারী বোঝা মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আমি পাগল হইয়া উঠিলাম।

বাবুর দল কহিলেন, সহরে যাও। কলিকাতার পথে পয়সা ছড়ানো আছে। অতীতের সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া মেয়ের মুখ চাহিয়া নূতন করিয়া আবার সব গড়িয়া তোলো!

তাঁহাদের মুখের উপর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। তাঁহারা গাঁটের পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন; সঙ্গে খরচও কিছু গুঁজিয়া দিতে ভুলিলেন না।

চোখের জল মুছিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া সহর কলিকাতায় আসিলাম।

অসংখ্য গাড়ী, ঘোড়া, লোকজন। সকলেই ব্যস্ত, অধীর—এ এক সমারোহ ব্যাপার! এ ভিড়ের চাপে পড়িয়া পিষিয়া ধূলা হইয়া যাইতে হয়! যেদিকে লোক চলিয়াছে, সেই দিকে তাহাদেরই পিছনে চলিতে আরম্ভ করিলাম। গঙ্গার প্রকাণ্ড পুল পার হইলাম। ভিড়ের আর বিরাম নাই! কোলাহলও অবিরাম! কোন্ পথে যাই? কোথায় গিয়া একটু আশ্রয় পাই?

হাঁটিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। দুলালী আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আর চল্‌তে পারছি না বাবা। কোথাও একটু বসবে, চল।

কোথায় বসি! বড় বড় বাড়ী—সব ছাদ গিয়া যেন আকাশে ঠেকিয়াছে! লোকের কোলাহলে চারিধার গম-গম করিতেছে! কোন বাড়ীর সম্মুখে ছোট একটু রোয়াক। সেখানেও বসিবার ঠাঁই নাই। রঙ-বেরঙের সামগ্রী লইয়া লোকেরা বেচা-কেনা করিতেছে। নিরুপায় হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িলাম। জনস্রোতের প্রবল ঘায় কোথায় ছিটকাইয়া সরিয়া গেলাম—দাঁড়াইবার সাধ্য কি! মেয়েটাকে ধরিয়া টানিয়া কোনমতে একটা খাবারের দোকানের সম্মুখে আসিলাম। দুলালীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কিছু খাবি, মা?

উদ্‌গ্রীব নয়নে দুলালী আমার পানে চাহিল। দোকানে ঢুকিয়া তাহাকে কিছু খাবার কিনিয়া দিলাম। নিজে ঢক্ ঢক্ করিয়া

খানিকটা জল খাইলাম। একটু সুস্থ হইলে দোকানীর সহিত আলাপ সুরু করিলাম।

বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছি শুনিয়া দোকানী মহা-উৎসাহে আলাপে যোগ দিল। কেমন জল, কাহার কি রহিল-গেল,—তাহারই বিস্তৃত বিবরণ খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ক্রমে শ্রোতাও বিস্তর জুটিল। সকলেরই শুনিবার কি সে আগ্রহ! কি কৌতূহল! মনে মনে ভাবিলাম, আঃ, ভগবান খুব আশ্রয় মিলাইয়া দিয়াছেন! মেয়েটাকে লইয়া এবার বুঝি জুড়াইতে পাইলাম!

কিন্তু কিছু পরেই ভুল ভাঙ্গিল। শুনিবার সব কথা শেষ হইয়া গেলে দোকানী কহিল,—তাহলে এখন এসো, কর্ত্তা। আমার দোকানে লোকজন আসছে—ঠাঁই জুড়ে চোপর দিন বসে থাকলে ত আমার চলবে না। পাশ দাও।

দুলালী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বড় শ্রান্তির পর বড় আরামের ঘুম! সে ঘুম ভাঙ্গাইতে মমতা হইল। কিন্তু দোকানী পর, সে শুনিবে কেন? তাহার অনুরোধের সুর ক্রমে চড়া হইয়া উঠিল—একটা ভৎর্সনাও মিলিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া দুলালীকে উঠাইয়া আবার পথে বাহির হইলাম! ঘুমে সে ঢুলিয়া পড়িতেছিল—পা ভাল সরিতেছিল না। টানিয়া তাহাকে লইয়া ফুটপাথে এক গাছতলায় বসিয়া পড়িলাম। দুলালী আমার গায়ে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিল। কিন্তু বরাত মন্দ—শান্তি মিলিবে কেন? এক পাহারা-ওয়ালা আসিয়া কহিল, রাস্তা বন্ধ করিয়া বসিলে চলিবে না। চোখ রাঙাইয়া সে উঠাইয়া দিল। আবার রাস্তায় দাঁড়াইলাম।

সেই রৌদ্রতপ্ত পথে কষ্টের আর সীমা ছিল না। বড় বাড়ী

দেখিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি,—এমন দাতা কেহ নাই যে শুধু-একটু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই দেয়? বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে গেলে গালপাট্টাওয়ালা মোটা দরোয়ানের দল হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া তাড়া করে। দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া কত ঘুরিলাম, কোথাও আশ্রয় মিলিল না।

তৃতীয় দিনে এক গলির মধ্য দিয়া চলিয়া একটা বাড়ীর রোয়াকে আসিয়া বসিলাম। দু'চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনিয়াছিলাম, মেয়ের মুখে দিলাম—নিজেও কিছু খাইয়া লইলাম। রাস্তার কলের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। তারপর একবার দেবতার নাম স্মরণ করিয়া এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিলাম,—বাবু—

সম্মুখের ঘরে বসিয়া এক বাবু গড়গড়ার নল টানিতেছিলেন। নিকটে বিছানার উপর বাঁয়া-তবলা প্রভৃতি বাদ্যের সরঞ্জাম পড়িয়া ছিল। চোখ তুলিয়া তিনি কহিলেন,—কি চাস?—একটা লোক ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—বাড়ীতে ব্যামো, ভিক্ষে মিলবে না—পথ ছ্যাখ্।

দুলালী জড়সড়ভাবে আমার বুকে মুখ লুকাইল। আমি কাতর স্বরে কহিলাম,—ভিক্ষে আমি চাই না, বাবা, চাকরি চাই।

বাবুটি কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিলেন—মেয়ের পানেও একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না। বাবু বলিলেন,—তোর জামিন কেউ আছে?

জামিন! কথাটা কানে নূতন ঠেকিল। অর্থ বুঝিলাম না। বাবুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। বাবু বলিলেন,—তুই চোর কি ছ্যাঁচোড়—তার পরিচয় কে দেবে?

আমি কহিলাম, আমি চোর বা ছ্যাঁচোড় নহি। নিজের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিলাম। বাবু মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, —ও-সব লোককে চাকরি দেওয়া যায় না, বাপু। তোমায় জানে-শোনে, এমন লোক আনতে পারো ত একটা মিলতে পারে—আমার জামাইয়ের বাড়ী একজন লোকের দরকার ছিল বটে! তা তোমার আবার সঙ্গে দেখ্‌চি একটা মেয়ে! বয়েসও তার স্থবিধের নয়!

কাঁদিয়া বাবুর পায়ে ধরিলাম—গৃহ-হীন আশ্রয়-হীন, নিতান্ত অসহায় আমি! বাবুর কিন্তু সেই এক কথা, অজানা অচেনা লোককে চাকরি দিয়া তিনি দায়ে ঠেকিতে পারেন না। তার উপর ঘাড়ে এক বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে!

মুখ চূণ করিয়া আবার পথে বাহির হইলাম। বাড়ী-বাড়ী ঘুরিলাম; সব জায়গায় সেই একই কথা। অজানা অচেনা লোকের জন্য এ মুল্লুকে ঠাঁই নাই! তবে আমি যাই কোথা? খাই কি? এ কি ভীষণ শাস্তি, ভগবান!

ক্রমে গাঁটের পয়সা ফুরাইয়া আসিল। যেদিন শেষ পয়সাটি বাহির হইয়া আমায় একেবারে সম্বলহীন রিক্ত করিয়া দিল, সেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মাথার মধ্যে আগুন ছুটিল। দুলালী কাঁদিতেছিল। ক্ষুধায় তাহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। সারাদিন এক গলির মোড়ে বসিয়া রহিলাম; দুলালী আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। আমি তাহার মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইলাম। খাইতে যাহার কিছু জোটে না—নিদ্রা তাহার প্রতি বড় সদয়। নিমেষে দুলালী ঘুমাইয়া পড়িল। আমি তাহার কপালের উপর হইতে কেশের গুচ্ছ সরাইতে সরাইতে কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম। আমি গরীব চাষা—কিন্তু দেশে আমার দ্বার হইতে

কোন ভিখারী-অতিথ্ অতৃপ্ত বুকে কোনদিন ফিরিয়া যায় নাই। সেই আমি,—আজ পথের কাঙালেরও অধম! শেষে স্থির করিলাম, ভিক্ষাই করিব! দেখি, সহরে ভিক্ষা মিলে কি না!

সহরের উপর দারুণ অভিমান জন্মিয়াছিল। এত বড় বিরাট শরীর লইয়া সজ্জিত সহর পড়িয়া আছে—গলির মোড়ে সারাদিন বিষণ্ণ মুখে আমি বসিয়া—আমায় দেখিয়া লোকের দয়া না হোক— এই কচি মেয়েটার শুষ্ক ম্লান মুখ দেখিয়াও কি কাহারও দয়া হয় না! সারাদিন আমারও সম্মুখ দিয়া এত লোক আসিল-গেল, কৈ কেহ তো একবার ফিরিয়াও চাহিল না, জিজ্ঞাসাও করিল না—কেন আমরা এখানে বসিয়া আছি? কি চাই? কি আমাদের দুঃখ? আশ্চর্য্য! এ কি আমার সেই ছোট গ্রামে সেই দারিদ্র্যের পুরীতে সম্ভব হইত! পঞ্চাশ জন লোক আসিয়া গায়ে পড়িয়া সাহায্য করিত! আর এই এত বড় সহর—পাষাণ—পাষাণ সহর! লোকের এখানে প্রাণ নাই, মন নাই, ভিতরে পাষাণ পুরিয়া নিজেদের লইয়াই সব ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে!

বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছিল। সম্মুখে এক বাবু চুরুট টানিতে টানিতে পথে চলিয়াছিলেন—গলায় ফুলের মালা, ফিট্ফাট্ পোষাক! গলির মোড়ে আর কোন লোক ছিল না। তাঁহারই কাছে ভিক্ষার জন্য প্রথম হাত পাতিব স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিলাম,—বাবু—

বাবু ফিরিয়া চাহিলেন। আমার জিভ কেমন জড়াইয়া গেল —কি বলিব? কখনও ভিক্ষা চাহি নাই—ভিক্ষা চাহিতে বাধ-বাধ ঠেকিল। তবু কথা যখন আরম্ভ করিয়াছি, তখন তাহা শেষ করিতেই হইবে! কোনমতে বল সংগ্রহ করিলাম, কহিলাম,—

আজ দুদিন কিছু খাইনি বাবা, সঙ্গে এই মেয়েটি—এর মুখের দিকে চেয়েও না হয়—

বাবু মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ যেমন দৃষ্টিতে ফিরিয়া চায়, দৃষ্টি ঠিক-তেমনি! আমি সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করিলাম! সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে বাকী রহিল না। আমার ইচ্ছা হইল, এখনই উহার টুঁটি টিপিয়া চোখ-দুটাকে টানিয়া বাহির করিয়া দিই!

বাবু বলিলেন,—তাইত—মেয়েটি ত তোর দেখচি রে, দিব্যি! তা এক কাজ কর্ না—পয়সার দুঃখ থাকবে না! আমার সঙ্গে আয়, মেয়েকে নিয়ে। আমি থাকবার ঠাঁই দেখিয়ে দেব। সুখে থাকবি দুজনে।

কথাগুলা যেন বাজের মত শুনাইল! কালকাতার অনেক কীর্ত্তির কথা গ্রামে বসিয়া শুনিয়াছিলাম। আমি বাবুর পানে কট্‌মট করিয়া চাহিলাম। বাবু ভড়কাইয়া সরিয়া গেল। আপদ চুকিল! আমিও নিশ্বাস ফেলিলাম।

আমার মাথায় তখন একটা মৎলব দেখা দিল। চমৎকার! ঠিক!

দুলালীকে উঠাইলাম। পথে মই ঘাড়ে করিয়া একটা লোক আলো জ্বালিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গার তীরে যাইবার পথ কোন্ দিকে! সে বলিল, বাঁয়ে ঘুরিয়া সোজা পশ্চিমে গেলে গঙ্গার তীরে পৌঁছিব।

দুলালীকে কোনমতে টানিয়া গঙ্গার তীরে আসিলাম।

•

স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে সব জ্বালা জুড়াইয়া গেল। চারিধারে

আঁধার নামিতেছিল। মাঝ-গঙ্গায় দুই-চারিখানা নৌকা হইতে আলোর রশ্মি আসিয়া জলে পড়িয়াছিল। তীরের কাছে কতক গুলা বোট বাঁধা ছিল—সেখানে মাঝিরা রান্না-বান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। দূরে এক জেটির উপর বসিয়া কে গান গাহিতেছিল—বড় করুণ সুর! আমার তপ্ত প্রাণ সে সুরে মাতিয়া উঠিল। চারিধার শান্ত, কি-এক আবেশে ভরা! ঘাটে তখন দুই-চারিটা কুলি স্নান করিতেছিল। আমি ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির উপর বসিয়া রহিলাম।

এই শান্ত নীরবতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। ঘরে-ঘরে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে—দিনের শেষে সকলে শান্তির কোলে মাথা গুঁজিয়া বিরাম পাইয়াছে। অতীতের কথা মনে পড়িল। সারাদিন ক্ষেত-খামার দেখাশুনার পর গৃহে ফিরিতাম—প্রদীপের আলোয় আলো-করা ছোট্ট ঘরখানি,—স্ত্রীর আদরে, মেয়ের আব্দারে সে ঘর উজ্জ্বল! সে ঘরে ঢুকিয়া দিনের সব ক্লান্তি নিমেষে ভুলিয়া যাইতাম। সে কি সুখ—কি আরাম! কোন্ পাপে আমার সে ঘর—সে আশ্রয় কর্পূরের মত আজ উবিয়া গেল! গেল যদি ত এ-মেয়েটা কেন আটকাইয়া রহিল? এ যে শিকলের মত আমায় আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে! মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। না, এ শিকল কাটিতে হইবে—কাটিবই। না কাটিতে পারি ত, এই শিকল গলায় বাঁধিয়াই সব শেষ করিয়া দিব!

কুলিরা চলিয়া গিয়াছিল—রাত্রিও তখন গভীর। বোটের উপর জীবনের কোলাহলটুকু নিঃসাড় হইয়া পড়িয়াছে। দুলালীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলাম। শান্ত সুরে

মৃদু ঢেউ তটের কোলে আছড়াইয়া পড়িতেছিল—সে যেন মুমূর্ষুর কাতর বিলাপের মতই করুণ, বেদনাময়! সে সুর আমাকেই ডাকিতেছিল। প্রাণ আমার নাচিয়া উঠিল। কোমর-ভোর জল ছাড়িয়া আরও-একটু অগ্রসর হইলাম। দুলালী ডাকিল,—বাবা—

আমি কহিলাম,—চুপ! ডুব দে—সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

দুলালী ডুব দিল না; কাঁদিয়া আবার ডাকিল,—বাবা—

আবার অমন করিয়া ডাকে! আমার রাগ ধরিল। তাহার ঘাড়টা টিপিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিলাম—বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিলাম! একটা পৈশাচিক বাসনা মনের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল—সে গর্জ্জন স্পষ্ট আমি যেন কানে শুনিতেছিলাম। আমার মাথায় খুন চাপিয়াছিল।

দুলালীও প্রাণপণে যুঝিতেছিল। তাহার মরিবার ইচ্ছা নাই,—সে মরিবে না!

নিতান্তই অবুঝ হতভাগা মেয়ে! এত দুঃখেও তাহার বাঁচিবার সাধ হয়! শেষে তাহারই জয় হইল। বোধ হয়, বাপের স্নেহ-দুর্ব্বল হাত মুহূর্ত্তের জন্য কেমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল! সে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। আমি হারিলাম—তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। জল খাইয়া উঠিয়া কাসিয়া সে ডাকিল,—বাবা, ও বাবা—মরে যাব, আমি মরে যাব গো।

আমি ভৎর্সনা করিয়া কহিলাম,—এত কষ্টেও তোর বাঁচবার সাধ হয়?

—আমি মরতে পারব না, বাবা। দুলালী ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে কান্নায় আমার রাক্ষসের প্রাণ নিমেষের জন্য গলিয়া গেল। কিন্তু তখনই ভাবিলাম, না, এ মায়া ভাল নয়! দুলালীকে মরিতেই হইবে—মরা ছাড়া উপায় নাই! সারা পৃথিবীর উপর রাগ ধরিয়াছিল!

মাথার উপর অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—আমি তীব্র দৃষ্টিতে নক্ষত্রগুলার পানে চাহিলাম। মনে হইল, মেয়েকে মারিয়া, নিজে মরিয়া দুনিয়ার এই এত-বড় শয়তানীর এতখানি নির্ম্মমতার চূড়ান্ত শোধ গ্রহণ করি—উহারা তাহার সাক্ষ্য থাকুক! অনেক চেষ্টা করিয়াও দুলালীকে ডুবাইতে পারিলাম না। প্রাণপণ শক্তিতে সে জীবনের জন্য সংগ্রাম করিতেছে! মনে হইল, তাহাকে তুলিয়া ঐ শাণের সিঁড়িতে আছড়াইয়া ফেলি!

দুলালীকে কোলে তুলিলাম। সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া—মাগো—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ও কি! কাহাকে ডাকে? আমার হাত-পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল —তাহাকে আছাড় দিতে হাত আর উঠিল না। দুলালী আবার ডাকিল,—ও বাবা, আমায় মেরে ফেলো না গো, আমি মরতে পারব না।

হায়রে অবোধ,—সে-কি অধীর আগ্রহে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আমাকে সে চাপিয়া ধরিল। আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। তাহার মুখে অজস্র চুমা দিয়া আমি কহিলাম,—না মা, মরতে হবে না। আয়, দুজনেই বেঁচে থাকি—যে-টুকু কষ্ট বাকী আছে, নিঃশেষে আয় তা ভোগ করি।

দুলালীকে লইয়া ঘাটে উঠিলাম। মরা হইল না। সে ক্ষণ কেন হারাইলাম! একটি ক্ষণ শুধু—না হারাইলে ত এ মনস্তাপ আজ সহিতে হইত না! জেলে বাস ঘটিত না!

উমেশ চুপ করিল। আমি কহিলাম,—চুপ কর, উমেশ। আর আমি শুনতে চাই না।

উমেশ কহিল,—না বাবু, আর একটু শুনুন—দয়া করে শুনুন প্রাণ আমার জ্বলে যাচ্ছে!

আমি কহিলাম,—আচ্ছা, বল।

উমেশ বলিতে লাগিল,—সে রাত্রিটা ঘাটের চাতালেই পড়িয়া রহিলাম। পরদিন উঠিয়া দেখি, দুলালীর চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে—গা আগুনের মত গরম। তাহার প্রবল জ্বর।

সেদিন বুঝি কি-একটা যোগ ছিল। ভোর হইতে না হইতেই ঘাটে খুব ভিড় দেখা গেল। ঘোমটায় মুখ-ঢাকা কচি বৌ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কেহই আর ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিল না—সকলেই স্নান সারিয়া গল্প সারিয়া হাসিয়া-হাসাইয়া আসিল,—চলিয়া গেল। দুই-চারিজন চালটা-আলুটাও বিতরণ করিতে কার্পণ্য করিল না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্পই। আমার ভাগ্যেও কিছু চাল ও তরকারী মিলিল। কিন্তু তা লইয়া কি করিব? কাঁচা চাল মানুষ কত চিবাইবে? কাঁচা আনাজ-তরকারীও কিছু খাওয়া যায় না।

মাথায় বুদ্ধি জোগাইল। বেলা তখন আবার পড়িয়া

আসিয়াছে, এক বোটের মাঝির কাছে গিয়া চালগুলা তাহাকে ঢালিয়া দিলাম—বলিলাম,—ভাই, চালগুলো নাও, নিয়ে এই আলু ক'টা আমায় পুড়িয়ে দাও! আজ দুদিন আহার জোটে নি।

মাঝি বাবু নয়, ভদ্র নয়—তাই সে অত জামিন-জানার সন্ধান করিল না—হিতোপদেশ দিল না; তাহার দয়া হইল। সে বলিল,—চালগুলো সেদ্ধ করে দেব? কিন্তু জেতে আমি মুসলমান—

ভাবিলাম, ওরে আমার জাত! আগে জান, না, আগে জাত! কিন্তু না, আমার দুলালী জ্বরের ঘোরে পড়িয়া আছে—দুই দিন তাহার অন্ন জোটে নাই—আর আমি ভাত গিলিব কোন্ মুখে! বলিলাম, না,—ভাত চাই না, শুধু আলু ক'টা পুড়িয়ে দাও।

সেই পোড়া আলু আনিয়া দুলালীকে ডাকিলাম,—মা—

অতিকষ্টে দুলালী চোখ মেলিল। আমি কহিলাম,—এই নে মা, খা,—

দুলালী আলু-পোড়া খাইল; আমায় বলিল,—তুমি একটা খাও, বাবা—

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পোড়া আলু মুখে দিলাম। সে যেন অমৃত!

সন্ধ্যার দিকে দুলালীর জ্বর ছাড়িল; সে কথাবার্ত্তা কহিল। আমার প্রাণ একটু শান্ত হইল। দুলালী বলিল,—বাবা, চল, বাড়ী যাই। এখানে এমন-করে ঘুরে কি করে বাঁচবো, বাবা?

সে কথা আমারও মনে হইয়াছিল। কিন্তু বাড়ী কোথায়

যে ফিরিব! জলের স্রোতে বাড়ীর চিহ্ন অবধি যে মুছিয়া গিয়াছে! আর ফিরিবই বা কি করিয়া? রেলের ভাড়া চাই—বিনা পয়সায় ত রেলে কেহ যাইতে দিবে না। সকল পথই যে আজ আমাদের বন্ধ! এই সহরের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। না পারি ত ঐ পাষাণের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরা ভিন্ন মুক্তিরও আজ আর-কোন উপায় নাই যে।

আবার রাত্রি আসিল। মাথার উপর আকাশে একরাশ নক্ষত্র আসর জমকাইয়া বসিল। তাহারা নীরব নেত্রে যেন আমাদেরই পানে চাহিয়াছিল! মানুষ কত দুঃখ সহিতে পারে, সহিয়া বাঁচিয়া থাকে, বিদ্রূপ-ভরা চোখে বুঝি তাহারা তাহাই দেখিতেছিল।

তখন বোধ হয় মাঝরাত্রি—একটু ঘুম আসিয়াছিল—সহসা একটা দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া উঠিয়া দেখি, দুলালী আমার পাশে নাই! কোথায় সে...দাঁড়াইয়া গঙ্গার পানে চাহিলাম—স্থির জল, মৃদু তরঙ্গভঙ্গে গান গাহিতেছে। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। ঘাটের উপর যে চাতাল ছিল, সেখানে আসিলাম—দেখি, ঘাটের উপর পথে একখানা ঘোড়ার গাড়ী। তিন-চারটা লোক ব্যস্ত হইয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া কহিল,—যাও—স্তব্ধ আকাশে বাজ্‌ যেমন হাঁকিয়া যায়, ঠিক তেমনই শব্দ করিয়া গাড়ী-খানাও ছুটিল! আমার মনে হইল, গাড়ীর মধ্যে কে যেন 'বাবা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিয়াই নীরব হইল। এ কি, এ না

আমার দুলালী? দুলালীকে চোরে চুরি করিয়াছে—গঙ্গায় সে যায় নাই!

পাগলের মত আমি গাড়ী লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম। কিছু হইল না—দুর্ব্বল পা, কি তাহার শক্তি যে গাড়ীর সঙ্গে সমানে ছুটিবে! হাঁফাইয়া শেষে একটা মোড়ের উপর বসিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, আর কেন এ মায়া! শিকল যদি এমনি করিয়াই ছিঁড়িল ত ছিঁড়ুক সে! আর সে শিকলের পিছনে ছুটিয়া কি ফল! যাক্—যে-ছোট সম্বলটুকু বাকী ছিল, তার ত বহুপূর্ব্বেই যাইবার কথা—তাহাকে ত ফিরিয়া পাইবার কথা নয়! গেল যদি যাক্! সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে! আঃ, কি মুক্তি—কি আরাম! এখন ঐ গঙ্গার কোলে পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে গিয়া আশ্রয় লইতে পারিব। প্রাণে অত্যন্ত উল্লাস হইল—হা-হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম! সে হাসির শব্দে চারিধার দুলিয়া উঠিল। আমিও সে স্বরে কাঁপিয়া উঠিলাম! তারপর একবার প্রাণ ভরিয়া বিশ্রাম করিয়া লইব ভাবিয়া সেই রাস্তার একধারে শুইয়া চোখ বুজিলাম।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন আমার সেই দেশের ঘরে পরম সুখে শুইয়া আছি, দুলালী আসিয়া ঠেলা দিয়া ডাকিতেছে, বাবা—

ধড়মড়িয়া উঠিলাম। একটা মানুষ সত্যই ঠেলা দিয়া ডাকিতেছিল,—এই-যো। চোখ মুছিয়া চাহিলাম,—সে দুলালী নয়, লাল-পাগড়ী-মাথায় এক পাহারওয়ালা! সে আমায় ঠেলা দিয়া দাঁড় করাইল,—হাতটা আঁটিয়া ধরিয়া গালি দিল, কহিল, আমি পাকা চোর; আমায় থানায় যাইতে হইবে!

কোন কথা বলিলাম না—তাহার ইঙ্গিতে চলিতে লাগিলাম। একটা বাড়ীর মধ্যে সে আমায় লইয়া আসিল। ছোট ঘর—টেবিল-চেয়ারে সাজানো! একধারে একটা বেঞ্চের উপর গাদা-প্রমাণ বাঁধানো খাতা। টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে, আর তাহারই সম্মুখে বেঞ্চে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া একটা লোক ঘুমাইতেছে। পাহারওয়ালা আমায় দাঁড় করাইয়া তাহাকে ডাকিল,—বাবু—

সে চোখ মেলিয়া চাহিল, পাহারওয়ালা সটান বলিয়া গেল, আমি পথে ঘুরিতেছিলাম। তাহাকে দেখিয়া পলাইবার চেষ্টা করি; সুবা হওয়ায় দৌড়িয়া গিয়া সে আমায় ধরিয়া ফেলে! 'কাজ-কাম' আমাব কিছুই নাই!

বাবু খিঁচাইয়া আমায় গালি দিল, আমাদেব জ্বালায় একদণ্ড তাহার চোখ বুজিবার অবসর মিলিবে না? প্রকাণ্ড খাতা টানিয়া কি-সব লিখিয়া আমায় বাবু জিজ্ঞাসা করিল, আমার ঘর-বাড়া কোথায়! কাজ-কর্ম্ম কিছু করি কি না!' আমি বলিলাম, কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় সহরে আসিয়াছিলাম—তার পর যাহা ঘটিয়াছে, সব খুলিয়া বলিলাম। বাবুটি পাহারওয়ালাকে কহিল,—ঘাটে নিয়ে যা একে; সব তদন্ত করে আয়।

পাহারওয়ালা বিরক্ত চিত্তে আমায় লইয়া বাহিরে আসিল, একটা দড়ি আনিয়া আমার কোমরে জড়াইল; এবং সেই দড়ির প্রান্ত ধরিয়া পশুর মত আমায় পথে খানিকটা ঘুরাইয়া এক পানওয়ালীকে ঘুম হইতে তুলিয়া তাহাকে দিয়া পাণ সাজাইয়া খাইয়া বিড়ি টানিয়া গল্প করিয়া আবার থানায় ফিরিল, ঘাটে গেল না।

তারপর আদালতে যথাসময়ে আমায় চালান দেওয়া হইল। সেখানে পাহার-ওয়ালাটা একটা কাঠের পিঁজরায় দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিল, যে, আমার কাজ-কর্ম্ম কিছুই নাই। অনেক রাত্রে পথে ঘুরিতেছিলাম—তাহাকে দেখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিলে সে আমায় ধরিয়া ফেলে! তার পর আমারই কথামত দুই-চারি জায়গায় ঘুরিয়া সে তত্ত্ব লয়—সকলেই বলে, আমায় চেনে না!

হাকিম জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে? তোর কাজ-কর্ম্ম কিছু আছে?

ভাবিয়াছিলাম, কথা কহিব না—কিন্তু কহিতে হইল। এতক্ষণ হাজতে বসিয়া চোর-ডাকাতের মুখে শুনিতেছিলাম, আমার জেল হইবে! আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম—কি দোষ করিয়াছি যে, জেলে যাইব? খাইতে পাই না—ঘর নাই, আশ্রয় নাই, ভগবান নিষ্ঠুর বাজ ফেলিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছেন, তাই মেয়েকে লইয়া পয়সা-উপার্জ্জনের চেষ্টায় সহরে আসিয়াছিলাম—সে পয়সাও গতর খাটাইয়া উপার্জ্জন করিব! সহরে ডাকিয়াও ত কেহ একদিন জিজ্ঞাসা করে নাই, কোথা হইতে আসিলাম—কি চাই? চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়া কেবলই কটু কথা ও হিতোপদেশ শুনিয়া আসিয়াছি—তাহাতে এমন কি অপরাধ করিলাম যে, জেলে যাইব! হাকিমকে কহিলাম, —চাকরি নেই, হুজুর—তাই তারই চেষ্টায় সহরে এসেছি! এসে কিছুই মেলে নি, একমুঠো অন্ন অবধি না! মেয়েটাকে শেষ চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে!

হাকিমের মুখের ভাবে বোধ হইল, কথাটা তিনি বিশ্বাস

করেন নাই! হারে অভাগা—ভগবান যাহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহেন না, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার পানে চাহিয়া দেখিবে, এমন আশা তুই এখনও করিস!

হাকিম কাগজে কি-সব লিখিয়া লইয়া আমায় কহিলেন,—একে জেরা কর্‌বি? সাক্ষী দিবি?

জেরা! সাক্ষী! তার অর্থ? কিসের সাক্ষী? আমি একবার চোখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিলাম। কাঠের পিঁজরার মধ্যে একটা দ্রষ্টব্য পশুর মত দাঁড়াইয়া ছিলাম। এক-আদালত লোক আমার পানে চাহিয়া—আমি মাথা নীচু করিলাম। হাকিম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—জেরা কর্‌বি?

আবার সেই উদ্ভট শব্দ! যে কথার অর্থও বুঝি না—তাহার কি করিব? আমি বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। হাকিম হুঙ্কার তুলিলেন,—একে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাস্?

আমি ঘাড় নাড়িলাম—না। এমন করিয়া মিথ্যা যে সাজাইয়া বলিতে পারে, তাহাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব? তাহার দিকে চাহিতে ঘৃণা করে—তাহার সহিত কথা কহিব?

হাকিম হুকুম দিলেন,—সে যেন গানের বাঁধা গতের মত এক-নিশ্বাসে তিনি বলিয়া গেলেন,—ছ' মাসের জন্য পঞ্চাশ টাকা জামিন, না দিলে ছ'মাস জেল।

ছোট ছেলেরা সাদা কাগজে যেমন কালির দাগ টানিয়া নিমেষে শুভ্র কাগজখানাকে কালো করিয়া দেয়, হাকিমের কলমের একটি আঁচড় আমার ললাটে, তেমনই করিয়া খানিকটা কালি লেপিয়া দিল। সন্ধ্যার সময় আঁটা গাড়ীতে চড়িয়া অসংখ্য চোর-ডাকাত-খুনীর সঙ্গী হইয়া আমি প্রথম জেলে আসিলাম।

জেলে বসিয়া মৃত্যুর কথা কেবলই মনে হইত। এক এক সময় ভাবিতাম, মাথায় মুগুর মারিয়া, না হয় প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া সব শেষ করিয়া দি। কিন্তু একটা সাধ সে সময় মনের মধ্যে উঁকি দিয়া আমায় মরিতে দিত না। সে সাধ—একবার শোধ তুলিব। যাহার মিথ্যা কথায় রিক্ত সকল-হারা হইয়াও স্বাধীন আমি এই-সব বদমায়েসের দলে পড়িয়া জেলে পাথর ভাঙ্গিতেছি, আমার শুভ্র জীবনে ছয়মাস ধরিয়া কেবল কলঙ্কের কালো কালি মাখাইয়াছি,—সেই-পাষণ্ডের সেই-মিথ্যার একবার চূড়ান্ত শাস্তি দিব! জেলের সঙ্গীরা আমায় টিটকারি দিত, আমি বোকা—মিছা জেল খাটিতেছি। ইহাতে মজা নাই, কেবল সাজাই আছে। চুরি করিয়া, লোককে মারিয়া-ধরিয়া জেলে আসিলে তাকেই বলে, জেল! নহিলে এ ত শুধু অদৃষ্টের ভোগ! তাহারা বেশ স্ফূর্ত্তির সুরে বলিত, যাহার উদরে অন্ন নাই, জেল ত তাহার কাছে কাশীর অন্নসত্র! এ-কথাটা নেহাৎ মন্দ শুনাইত না।

ছয়মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। বাহির হইয়াই—সেই পথের কথা প্রথমে মনে পড়িল। জোর করিয়া দুলালীকে ভুলিলাম—স্ত্রীকে ভুলিলাম—নিজের অতীত ভুলিলাম! সে সব কথা মনে পড়িলে মন দুর্ব্বল হয়, সমস্ত শক্তি উবিয়া যায়!

ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার পর সেই পাহারওয়ালাকে দেখিলাম—সেই মোটা শরীর—বিপুল গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন বিশ্রী মুখ! সে সেই পানের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে-চিবাইতে পানওয়ালীর সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য করিতেছিল। দেখিয়া আমার প্রাণে দৈত্য নাচিয়া উঠিল! বাঘের মত ঝাঁপাইয়া তাহার

ঘাড়ে পড়িলাম। দাড়ি ধরিয়া সবলে টানিয়া তাহাকে ভূমে ফেলিলাম—তার পর অজস্র কিল-চড়-লাথিতে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলাম। আমার জ্ঞান ছিল না—চোখের সম্মুখে মহাকালী লোল রসনা মেলিয়া নৃত্য করিতেছিল—করালিনী কালীকে সেদিন যেন আমি সত্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম! নৃমুণ্ড-মালিনীর কি সে ভীষণ নৃত্য! চকিতে সে দৃশ্য সরিয়া গেল—চোখের সম্মুখে রক্তের নদী বহিল।

বিস্তর লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল—পাহারওয়ালা তখন রক্তে স্নান করিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

তার পর আবার সেই আদালতে হাকিম, উকিল ও পেয়াদার ভিড়ের মধ্যে হাজির হইলাম। পাহারওয়ালাটা কোনমতে প্রাণে রক্ষা পাইল—কিন্তু তাহার সে ভাঙ্গা নাক আর খাড়া হইল না।

আমার দুই বৎসর জেলের হুকুম হইল। স্থির হইয়াই সে শাস্তির আদেশ শুনিলাম। যখন ডক্ হইতে আমায় লইয়া গেল, তখন সে পাহারওয়ালা একদিকে দাঁড়াইয়াছিল—ভাঙ্গা নাক—কাটা কপাল—ফাটা মাথা—মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া আমি হাজতে আসিলাম। মনে আনন্দ হইল—জয়ের আনন্দ! সেবার বিনা-দোষে জেলে ঢুকিয়াছিলাম! এবার মনে ক্ষোভ রহিল না, দোষ করিয়া জেলে চলিয়াছি।

উমেশ স্থির হইল। সে ফুঁসিতেছিল। চোখ দুইটাও জ্বলিতেছিল। সে আরও-কিছু বলিবে মনে হইতেছিল—একটু যেন জিরাইয়া লইতেছে! এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া

সাতটা বাজিয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উমেশ কহিল,—বাবু—

আমি কহিলাম,—বেলা হয়ে যাচ্ছে, উমেশ, এখনই ত আবার বেরুতে হবে—। কাজ-কর্ম্ম চুকিয়ে দুপুরবেলা এসে বাকিটুকু শুনব'খন।

উমেশ কোন কথা কহিল না, আমার পানে চাহিয়া রহিল,—উদাস, করুণ দৃষ্টি!

মুক্তি

সেদিন রবিবার; ভোর হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঠাণ্ডা জলো হাওয়ার দৌরাত্ম্যও অতিরিক্ত বাড়িয়াছিল। দোতলার বৈঠকখানার সার্শি প্রভৃতি রীতিমত আঁটিয়া সিগারেটের ধোঁয়ার সহিত বাঙলা মাসিক পত্রের প্রবন্ধের গবেষণাপূর্ণ ভাবগুলা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে ছিলাম। কলিকাতার রাস্তাগুলি ছোটখাট নদীর মত হইয়া উঠিয়াছে! দুই-একটা দুরন্ত পল্লী-বালক কলার ভেলা জলে ভাসাইয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে সাঁতার কাটিতেছিল; তাহাদের সন্তরণের শব্দ ও উচ্চকণ্ঠের কলরোল মধ্যে মধ্যে আর্দ্র বায়ু-প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতেছিল।

এমন সময়ে বেহারী আসিয়া কহিল,—একটী বাবু এসেছেন।

এই বর্ষায় বাবু! কোন দুরদৃষ্ট মক্কেল ছাড়া আর কে!—ওপরে নিয়ে আয়—বলিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলাম, এবং ফ্লানেল সার্টের বোতামগুলি আঁটিয়া গলাবন্ধে গলাটা একটু সযত্নে জড়াইয়া অতিথির জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলাম। আগন্তুক কক্ষে প্রবেশ করিল। আরে, এ যে প্রিয়বন্ধু সতীশ! আমি সোৎসাহে চেয়ারখানা ঠেলিয়া দুই হাত সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি হে সতীশ যে! কবে এলে আগ্রা থেকে? সতীশ আগ্রায় ডাক্তারি করে।

—এই চার-পাঁচদিন হল।

—তা এত বৃষ্টিতে কষ্ট করে এলে কেন? আর কি সময় ছিল না?

—না ভাই, বেশীদিন থাকতে পারব না! বিশেষ দরকারে পড়েই আসতে হয়েছে—আবার পরশু বোধ হয় যেতে হবে। এ ক'দিন আসতেই পারিনি; আবার যাবার সময় একবার শ্রীরামপুর হয়ে যেতে হবে।—শ্রীরামপুরে সতীশের শ্বশুরালয়।

—ছেলেমেয়েরা কাথায়?

—আগ্রায়।

তার পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আশৈশব বন্ধুযুগলের সে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়া কাহারও বিরক্তিভাজন হইতে ইচ্ছা করিনা।

সে আজ প্রায় দশ-বারো বৎসরের কথা। সতীশের পিতা তখন হুগলীর সবজজ ছিলেন; সতীশরা আমাদের প্রতিবাসী ছিল। 'পরস্পরের ছাড়াছাড়ির পর সতীশের সঙ্গে আমার কংগ্রেস-মণ্ডপে বা দু'-একবার দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল।

অনেক কথাবার্ত্তা ও কুশল প্রশ্নাদির পর সতীশ কহিল,—কাব্যচর্চ্চা চলছে কেমন?

সতীশ লোকটা কবি। সাহিত্য-সমাজে তাহার প্রতিপত্তি নিতান্ত অল্প নয়।

আমি কহিলাম,—মোটে নয়!

বিস্ফারিত নয়নে সতীশ কহিল—বল কি হে?

আমি কহিলাম,—হাঁ গুরুদেব! সে রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছি!

সতীশ কহিল,—হঠাৎ ?

আমি কহিলাম,—তেমন হঠাৎ নয় হে ভায়া। গূঢ় কারণ আছে!

—কি, বলেই ফেল না।

সিগারেটের টিনটা সতীশের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া আমি কহিলাম,—তবে শোনো—

যখন সতীশ ও আমি এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়ি, তখন প্রায়ই Literary Associationএ সতীশ স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করিয়া সকলের নিকট বাহবা পাইত। সেই সময় ব্যগ্র কৌতূহলে একদিন সতীশকে বলিয়াছিলাম,—আমাকে Poetry লিখতে শেখাবে? সতীশ হাসিয়া বলিয়াছিল,—একটু ভাব্‌তে শেখো, আপনিই লিখ্‌তে পারবে! ঐ দেখ চাঁদ, ঐ দেখ গঙ্গার ঢেউ, ঐ দেখ মেঘের ছুটোছুটি। একটু ভাব! দেখবে, ও সকলে কত কবিত্ব! আমি গদ্‌গদ্ ভাবে ভক্ত শিষ্যের মত সতীশের কথা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। কিন্তু হা অদৃষ্ট! সমস্ত চাঁদখানা নিংড়াইয়া সেই ছেলেবেলার কাণাশে বুড়ীর গল্প ছাড়া আর কোন ভাবই পাইলাম না; মুগ্ধচিত্তে ভাবিলাম, আমার Brainটা কি dry!

লোকে বলে, যত্ন করিলে রত্ন মেলে! চেষ্টায় আজ অসভ্য জাপান সভ্যতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছে; এবং চেষ্টার বলেই নাকি বণিকের জাতি ইংরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আপনার অমোঘ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে! দুর্ল্লভ-তপস্যানুগতা কবিতা-দেবীও দীর্ঘকাল আমার কালি-কলমের অত্যাচার নীরবে সহিতে পারিলেন না; তাঁহাকে দর্শন দিতে হইল!

যেদিন ভাল বাঁধানো খাতায় সযত্নে ও বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম,—

হে প্রতাপ ভারতের বীরচূড়ামণি,
অদ্ভুত বীরত্ব তব কেমনে বাখানি!

সেইদিন হইতেই আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোথা হইতে একটা গুরুত্ব আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিল। সতীশ কবিতা দেখিয়া কহিল—বাঃ, এই যে কিছু কিছু ভাবতে শিখেছ! বুঝলে ভাই, Poetry লেখার প্রধান mysteryই হচ্ছে thoughtfulness, ভাবুকতা, তন্ময়তা।

আমি বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া কহিলাম,—সে কথা খুব বুঝি—আমাকে আর কি বোঝাবে ভাই?

তাহার পর দ্রুত

হে ঈশ্বর, অব্যক্ত অচিন্ত্য,
ধরণী না রহিলে কে তোমাকে জান্‌ত?

ওগো নদী, কোথা যাও কুলুকুলু বেয়ে?
কাহার উদ্দেশে, কহ, কোন্ গান গেয়ে?

ওগো সুন্দরী নীলবসনা,
শিথিল কবরী, কুন্দ ঝরিছে,
কি করিছ, অয়ি শোভনা!

প্রভৃতি রাশি রাশি কবিতা আমার মগজ হইতে বাহির হইয়া খাতার পৃষ্ঠায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন আমাকে বাধা দেয়, কার সাধ্য? গিরিদেহ ভেদ করিয়া একবার যখন স্রোতস্বতী

ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন কে তাহার গতিরোধ করে? আমার কবিতা-প্রবাহিণীতে প্রকৃতই বাণ ডাকিয়াছিল, কিন্তু কেমন করিয়া ভাঁটা পড়িল, তাহাই এখন বলিতে বসিয়াছি।

সতীশ সিগারেট ধরাইয়া কহিল,—বল, আমি খুব মন দিয়ে শুন্‌ছি।

আমি বলিতে লাগিলাম—

এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তুমি লাহোর চলিয়া গেলে, আমিও প্রেসিডেন্সিতে পড়িব বলিয়া কলিকাতায় আসিলাম। হোষ্টেলে না থাকিয়া বেনেটোলার একটা কক্ষ অধিকার করিলাম, এ সকল সংবাদ আর নূতন করিয়া কি দিব? তুমি ত সমস্তই জান।

এফ্-এ ক্লাশটায় আমার প্রতিভা তেমন স্ফূর্ত্তি পাইল না। নূতন কলিকাতায় যাইয়া মিটিং এ্যাটেণ্ড করিয়া ও থিয়েটার দেখিয়া কাব্যচর্চ্চার বড় একটা অবকাশ মিলিত না; সেই জন্য এফ্-এ পরীক্ষার ফলটাও কিছু ভাল হইয়াছিল। পরে যখন বি-এ পড়িতে লাগিলাম এবং কলিকাতার নাগরিক জীবনে একটু অভ্যস্ত হইয়া পড়িলাম, সহরের মত্ততা ও ব্যস্তভাব অবসাদের তুফান তুলিয়া আমাকে আকুল করিল, তখন আবার আমার সেই মরক্কো-বাঁধানো সুদৃশ্য খাতাখানি খুলিয়া কাব্যচর্চ্চায় মন দিলাম। মেসের সকল ছাত্রই এই আকস্মিক প্লাবনে অত্যধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই মেসে আমার পাশের ঘরেই গোপাল নামে একটি নিরীহ ছাত্র বাস করিত। সে রিপন কলেজে পড়িত। বেচারীর বাড়ী বারাশতে। আমার কবিতা-প্লাবন তাহাকেও কিঞ্চিৎ বিহ্বল করিয়াছিল—সে কেমন

তন্ময় হইয়া আমার কবিতা পাঠ করিত, এবং প্রশংসমান নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া কহিত,—মন্মথ, এটার ত বড় excellent ভাব! কিন্তু সত্যনাথ নামক একটি ছাত্র তাহা শুনিয়া নিতান্ত অধীরভাবে বলিয়া উঠিত,—ভাব বলে ভাব! একেবারে যাদু ব'নে যেতে হয়। এ ভাব যখন জমাট বাঁধবে, তখন মাইকেল রবি যে কোথায় ভেসে যাবে, তার ঠিকানা নেই!

আমি মনের ভাব মনে চাপিয়া রাসকেলের মৃত্যু কামনা করিতাম, এবং সেই অবসরে গোপালের সঙ্গে সত্যনাথের একটা ছোট-খাট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিত। সত্যনাথ দূর-সম্পর্কে বড় বৌদির কি রকম ভাই হইত, সুতরাং আমি তাহার তীব্র মন্তব্যগুলি নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করিতাম।

শুধু এইটুকু করিয়াই যদি ক্ষান্ত থাকিতাম, তাহা হইলে বুঝি পরে আর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু আমি মাত্রা ছাড়াইয়া চলিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র ও মেরি করেলি হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্যোপন্যাসিক পরাণচন্দ্রের পুস্তক পর্য্যন্ত সবই আমি ক্রয় করিতে লাগিলাম। পাঠ্য পুস্তকগুলাকে নিতান্ত তাচ্ছল্য করিয়া দূরে ফেলিয়া রাখিতাম।

উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমি "প্রেমিকা" নামে একখানা নাতিবৃহৎ কাব্য লিখিয়া ফেলিলাম। গোপাল তাহা পড়িয়া বই হইতে চোখ না তুলিয়াই কহিল,—ওঃ, it is second বিদ্যাপতি! সত্যনাথ কিন্তু দু'পাত উল্টাইয়াই কহিল,—

চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!
ভস্মরাশি করে ফেল কর্ম্মনাশা জলে।

আমি মনে মনে সত্যনাথের আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া

কম্পিত ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম—ষ্টুপিড্ রাস্কেল, তুমি যদি কখনও আমার লেখা পড় তো তোমার অতি বড় দিব্যি আছে।

. গোপাল আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল,—সত্যর মত হিংসুটে যদি দুটি থাকে! সত্যনাথ কহিল,—তা বলে তোমার মত খোসামুদি করে আমি কারও মাথা খেতে পারি না।

যাক্—তুমি এটা বেশ জানো, উপন্যাসের আর একটা নাম প্রেমের শ্রাদ্ধ! এই এতগুলো প্রেম-কাহিনীর চর্চ্চা করিয়া আমার হৃদয়ে যে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহা মনে করিয়ো না। একে রোমান্সের কবি, তার উপর এই সকল রাশীকৃত উপন্যাসের পুঞ্জীভূত প্রেম বিদ্রোহী হইয়া আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। আমি সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতাম, কখন্ আমার এই স্কন্ধদেশ-পরিব্যাপ্ত সুরক্ষিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে পরিশোভিত কবিজনোচিত মাধুর্য্য-পূর্ণ মুখখানির উপর কোন কিশোরী তাঁহার কজ্জলকৃষ্ণ নয়নের একটা কটাক্ষ-শর নিক্ষেপ করিয়া আমাকে সম্পূর্ণ জখম করিয়া ফেলে! এ জগতে তরুণ কবিকে অনেক সামলাইয়া চলিতে হয়।

এই স্থানে চুরোটিকার ক্ষুদ্র জীবন ভস্ম হওয়ায় একটী নবীন চুরোটিকা গ্রহণ করিতে হইল।

সতীশ ব্যগ্রভাবে কহিল,—তারপর?

আমিও চুরোটিকাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইয়া একটী দীর্ঘ 'আকর্ষণের' পর কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়াইয়া কহিলাম,—তারপর আর কি! একদিন রবিবাবুর সেই—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরে পড়ে কে জানে?—

গানটার অর্থ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

আমাদের মেশের সম্মুখেই একখানি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ছিল। তাহার অধিকারী নন্দবাবু হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাটী হইতে একটী সুমিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীতোচ্ছ্বাস আমাদের মেশস্থ ছাত্রগণের পাঠের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইল। আমার কক্ষ হইতে নন্দবাবুর দ্বিতলের হল-ঘরটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। গোপাল ছুটিয়া আসিয়া আমাকে কহিল,—মনু শুনচ? কে গাইছে ভাই, দিব্য গলা!

আমি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম, কহিলাম—ঐ যে একটী মেয়ে গান গাচ্ছে।

বালিকা তখন গাহিতেছিল,

অলি বার বার ফিরে যায়
অলি বার বার ফিরে আসে
তবে ত ফুল বিকাশে।

গান শুনিয়া নন্দবাবুর পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হইল। আমার এক সহপাঠীর নিকট নন্দবাবুর পুত্র শরৎকুমারের নাম শুনিয়াছিলাম; শরৎ মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র। তাঁহার সহিত আলাপের বেশ একটা সুযোগও ঘটিল। একদিন ফুটবলের ম্যাচ দেখিব বলিয়া মেস হইতে বাহির হইয়াই দেখি, শরৎকুমারও ম্যাচ দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। অযাচিতভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম,—কোন্ কোন্ প্লেয়ার ভাল খেলে, কোন্ দলের

জিতিবার সম্ভাবনা—প্রভৃতি। অল্পকালের আলাপেই শরতের সহিত বেশ একটু সৌহার্দ্দ্য জন্মাইল। একদিন সন্ধ্যার সময় গোলদীঘিতে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি শরৎকে কহিলাম, —আপনাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে গান হয়, শুন্‌তে পাই। আপনি কি গাইতে পারেন?

শরৎ কহিল,—ও আপনি গানের কথা বল্‌ছেন! ও লীলা গায়, আমার ছোট বোন্। হ্যাঁ, নেহাৎ মন্দ গায় না!

আমি কহিলাম,—মন্দ কি? বেশ সুন্দর গায়। আমি ত পড়া-শুনা ছেড়ে গান শুন্‌তে বসে যাই!

শরৎ কহিল,—সে গান আপনার এত ভাল লাগে! বেশ, কাল রাত্রে আমাদের বাড়ী আপনার নিমন্ত্রণ রইল। গান শুন্‌তে যাবেন, আর যদি আপত্তি না থাকে তা হলে ঐখানেই কিঞ্চিৎ জলযোগ কর্‌বেন।—কিরূপ পুলক-কম্পিত স্বরে শরৎকুমারকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ!

শরৎ হারমোনিয়মে সুর প্রদান করিয়া লীলাকে কহিল,—লীলা, রবিবাবুর সেই গানটা গাও ত!

লীলা প্রথমে একটু সঙ্কোচের ভাব দেখাইল। আমি কহিলাম,—গাও না! লজ্জা কি?

এই কয়টী কথা বলিতেই আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

অবশেষে লীলা আমার কথায় একটুও মনোযোগ না করিয়াই গাহিতে লাগিল,—

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুলহার !
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার ।

সেই সরলা বালিকার সরল কণ্ঠোচ্ছ্বাসে যে অপূর্ব্ব বীণাধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, তাহাতে আমি আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। আমার মানস-নয়নের সম্মুখে একটী মাধুরী-মণ্ডিত স্বপ্নপুরী ফুটিয়া উঠিল। জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া, বালিকার অস্তিত্ব ভুলিয়া আমি মনে করিলাম, কোথায় কোন্ সুখময় নিভৃত কোণে একটী প্রণয়িণী নায়িকা তাহার সুন্দর হৃদয়রঞ্জন নায়কের উদ্দেশে তাহার প্রাণের অপূর্ব্ব ভক্তি-উচ্ছ্বাস নিবেদন করিতেছে ! অনেকগুলি গান হইল বটে, কিন্তু সেই হৃদয়-রঞ্জনের বন্দনাগীতির অপূর্ব্ব বীণা-স্বর মোহের তুফানে আমাকে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল।

মন্ত্র-চালিতের মত মেশে ফিরিলাম। সে রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া বারবার বালিকার কথা ভাবিতে লাগিলাম। বেশ মেয়েটী ! যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণবতী ! আহা, লীলার সহিত যদি আমার বিবাহ হয় ! আমার মনে হইল, তাহা হইলে, বুঝি, আমি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হই ! এবং আমার এই মরক্কো-বাঁধা কবিতার খাতাখানি সমস্ত কবিতা-সমেত লীলার অঙ্গুলি-হেলনে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারি।

মনে করিলাম, সকালে গোপালকে ডাকিয়া স্পষ্টই বলিব, আমি লীলাকে ভালবাসি ; তাহারা আমাদের পাল্টা ঘর, বিবাহে বাধা নাই ; কোন রকমে যোগাড় করিয়া তাহার সঙ্গে আমার বিবাহটা ঘটাইয়া দাও। কিন্তু সকালে গোপাল যখন আমার ঘরে চা পান করিতে আসিল, তখন তাহাকে দেখিয়াই

ভাবিলাম, ছি, ছি, এ কথাগুলো একে বল্লে এখনই আমাকে পাগল মনে করে হেসে উড়িয়ে দেবে। আট বৎসরের মেয়ে লীলা, তাকে দেখে একজন কবির প্রেম! মেস-শুদ্ধ একটা কেলেঙ্কারী হয়ে পড়েছিল আর কি! ছি, ছি, ভারি লজ্জার কথা!

ইহার দুই একদিন পরে ষ্টার থিয়েটারে সকলে মিলিয়া মলিনা বিকাশ ও বিবাহ বিভ্রাটের অভিনয় দেখিতে গেলাম। পরদিন অভিনয়ের সমালোচনা হইতেছে এমন সময় সত্যনাথ কহিল,—ওর ভেতর বিবাহ বিভ্রাটটা খুব ভাল, মলিনা বিকাশটা স্রেফ্ গাঁজখুরি! খালি প্রেম, প্রেম, জ্বালাতন করে মেরেছিল!

আমি কহিলাম,—কি! প্রেমটা গাঁজাখুরি হলো! এমন না হলে আর বিয়ে!

সত্যনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল,—গাঁজাখুরি নয়তো কি দাদা? It is the production of an idle brain— কৈ, এ পর্য্যন্ত কাকেও ত প্রেমে পড়্‌তে দেখ্‌লুম না!

আমি কহিলাম,—কবিদের কথাগুলো তবে সব উড়িয়ে দিতে চাও! কালিদাস, সেক্সপিয়র বঙ্কিমবাবু এঁরা প্রেম নিয়ে এত মাথা ঘামালেন—

এই সময় আমার মুখের কথা লুফিয়া গোপাল বলিয়া উঠিল,—সে সব হলো গাঁজাখুরি, আর আমাদের সত্যনাথ বাবু যা বল্‌লেন, তাই ধ্রুব সত্য!

আমি গদগদ স্বরে কহিলাম,—প্রেম মিথ্যা! আহা, যদি জগতে কিছু সত্য থাকে ত সে প্রেম।

সত্যনাথ আবার হাসিতে হাসিতে কহিল,—কিহে ভায়া, অত রাগ কেন? কারুর প্রেমে পড়েছ নাকি?

আমি মুখ বিকৃত করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিলাম,—যাও, যাও, তোমার সকল কথায় তামাসা ভাল লাগে না।

বাস্তবিক, প্রেমের মহিমায় আমি যেন একটু অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম!

মানুষের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্যবশতঃই হউক বা যে কারণেই হউক, যে-গোপাল আমাকে উচ্চমঞ্চে চড়াইয়া প্রশংসাকুল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত, আমি সেই উচ্চমঞ্চে বসিয়াই সেই নিরীহ বেচারার কর্ণমর্দ্দন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতাম না। বাস্তবিক ইদানীং আমি গোপালের উপর যথেষ্ট উপদ্রব করিতাম। একদিন সন্ধ্যার সময় একটা সামান্য তামাসায় গোপালের সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল। হতভাগা গোপাল, যাহাকে আমি প্রথম ভাগের গোপালেরই মত সুবোধ ও শান্ত মনে করিতাম, সেই কি না বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া সত্যনাথকে সব কথা বলিয়া দিল! এই জন্যই কথায় বলে, ভবিতব্য অখণ্ডনীয়।

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিমর্ষভাবে আপনার কক্ষে বসিয়া আছি, এমন সময় সত্যনাথ আমার কক্ষে প্রবেশ করিল; সত্যনাথ কহিল,—হ্যাঁরে মনু, এ কি শুনচি? আমি বিরক্তভাবে কহিলাম,—কি আবার? সত্যনাথ কহিল,—শুনচি, তুই নাকি প্রেমে পড়ে গেছিস্? আমি উদ্ধতভাবে কহিলাম,—মিথ্যা কথা। কে বললে? সত্যনাথ কহিল,—গোপাল বললে। তুই নাকি তাকে সব কথা বলেছিস্!

আমি ক্রুদ্ধস্বরে কহিলাম,—পাজি, শুয়ার মিথ্যা কথা বলেছে।

সত্যনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল,—আমিও ত তাই বলি! দেখিস্ ভাই, হুঁসিয়ার! সামনেই একজামিন—প্রেমে পড়তে হয়তো একজামিনের পর পড়িস্, এখন নয়।

আমি কহিলাম,—দেখ সত্যনাথ, আমার সম্বন্ধে তোমার অত মাথা-ব্যথা করাটা আমার বড় খারাপ লাগে। কেন তুমি আমাকে জ্বালাতন কর? সত্যনাথ গম্ভীরস্বরে কহিল,—কারণ তোমাদের সঙ্গে আমার একটু সম্পর্ক আছে;—আমি প্রকৃতই তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি উত্তেজিত স্বরে কহিলাম,—you are too impertinent! তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক স্বীকার করি না।—সত্যনাথ ধীরে ধীরে আমার কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেবার পূজার ছুটিতে বাড়ী গেলাম না; দাদাকে লিখিলাম,—বাড়ীতে নানা গোলমালে পড়ার ক্ষতি হইতে পারে, এখানে পড়াশোনা নির্ব্বিঘ্নে চলিবে বলিয়া আশা হয়—ইত্যাদি।' দাদা লিখিলেন,—যাহা ভাল বুঝিবে তাই করিও।

বিজয়ার দিন আমি কতকগুলো সেণ্ট্‌ সাবান আর একখানি রবিবাবুর গানের বহি লইয়া শরৎদের বাড়ী চলিলাম। শরতের সহিত দেখা করিয়া এসেন্সের বাক্সটা দিয়া কহিলাম,—ভাই, পূজার উপহার। শরৎ হাসিয়া কহিল,—এ আবার কি পাগলামি! এ-সব কেন?

আমি কহিলাম,—পূজার দিনে আত্মীয়-বন্ধুকে উপহার দিতে হয়। পরে কহিলাম,—লীলা কোথায়? শরৎ কহিল,—কেন? ওগুলো দেখি!—সাবানের বাক্সের গায় ও বইখানার উপর লেখা

ছিল, "শ্রীমতী লীলার জন্ত পূজার উপহার।" শরৎ কহিল,—লীলাকে আবার এ-সব দেওয়া কেন? সত্যই ত শরৎকে উপহার দিবার অধিকার আছে, কিন্তু লীলাকে কেন? ইহার কি সদুত্তর দেওয়া যায়? সত্য কথাটা বলিব কি? ছি!

সহসা একটা উত্তর যোগাইল। তাড়াতাড়ি কহিলাম,—সে বেশ গান গাইতে পারে কিনা, তাই তারই appreciation করে তাকে পুরস্কার দেওয়া যাচ্ছে—এক বাক্স দেশী সাবান আর একখানা রবিবাবুর গানের বই।

এমন সময় লীলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। লীলা কহিল,—বড়দা, বাবা তোমাকে ওপরে ডাক্‌ছেন—আমাদের ভাসান দেখাতে নিয়ে যেতে হবে।—

—ওরে লীলা তোর জন্যে কি প্রাইজ্ এসেছে, দেখ্—বলিয়া শরৎ উপরে চলিয়া গেল।

আমি তখন লীলার হস্তে উপহার-দ্রব্য দিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলাম,—লীলা, এগুলি তোমার! লীলা প্রফুল্লভাবে কহিল,—বাঃ, এ বেশ ত! এ বুঝি দিশী সাবান? বেশ গন্ধ—না মনুবাবু? আমি কহিলাম,—হাঁ।

অল্পক্ষণ পরেই লীলা কহিল,—কিন্তু মনুবাবু, ছোটদা জান্‌তে পারলে আমাকে মেরে ধরে এ সাবান কেড়ে নেবে। সেদিন বড়দা' আমাকে কেমন একটা পুতুল কিনে দিয়েছিল, ছোটদা কেড়ে নিয়েছে। ছোটদা বড় মারে আমাকে। আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলাম,—না, না, কেড়ে নেবে না, আমি শরৎকে বলে দেব এখন।

—হ্যাঁ তাই দেবেন—বলিয়া লীলা তেলের শিশিটা দেখিতে লাগিল।

মৃদু বায়ু কুন্তলগুচ্ছ উড়াইয়া তাহার কপালের উপর ফেলিতেছিল, আমি মুগ্ধভাবে তাহা দেখিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কম্পিতকণ্ঠে আবার ডাকিলাম,—লীলা—

—কেন মনুবাবু?

—তুমি আমাকে ভাল বাস?

—হ্যাঁ।

—কত ভাল বাস?—

—খু-উ-ব্!

সরলা বালিকা—এ ত প্রেমিকার কথা নয়! এ কথাটা আমার দিকে চাহিয়া অম্লান বদনে বলিয়া ফেলিলে! একটু সঙ্কোচ হইল না? প্রেম যে সঙ্কোচময়! হায়! এটা বুঝি তবে উপহার-দানের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ একটা নীরস কর্ত্তব্য-পালন! আমি নাছোড়বান্দা ভাবে আবার কহিলাম,—'লীলা, আমি তোমার বিয়ের জন্যে খুব ভাল সম্বন্ধ করছি—

—ধেৎ! বলিয়া লীলা ছুটিয়া পলাইল; অবশ্য পলাইবার সময় উপহার দ্রব্যগুলি লইয়া যাইতে সে ভুল করিল না। হায়, এ জগতে নারী-হৃদয় কি স্বার্থপর!

ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া লই। "গায়িকা" কাব্যখানা লিখিতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল; তাহার ফলে এই দাঁড়াইল যে, সে-বৎসর পরীক্ষায় তিনটী বিষয়েই equilateral triangleএর তিনটী sideএর মত সমান ভাবে ফেল হইয়া বসিলাম! সত্যনাথ ডবল অনার্স লইয়া পাশ

হইল। ফেল হইয়া যখন জানিলাম, যে গোপালটাও ফেল হইয়াছে, তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম। সে হতভাগা যদি পাশ করিত, তাহা হইলে আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইয়াছিল আর কি!

দাদা বলিলেন,—আমাদের বংশে কেউ কখনও ফেল হয় নি, তুমিই প্রথম ফেল হলে! আমি অবনত মস্তকে কহিলাম,—বি-এটা আজ কাল বড় stiff হয়েছে, পাশ করাটা কেবল chance.

—সেজন্যে তুমি ফেল হওনি! তোমার ফেল হবার কারণ, তুমি একটুও পড়নি।

আমি কিছু বলিলাম না। দাদা আবার বলিলেন,—খালি ছাই-ভস্ম লিখ্‌লে কি চলে? ও সব পাগলামি যাবে কবে? যদি একটুও লিখ্‌তে পার্‌তে, তাহলেও না হয় কথা ছিল। কবি হওয়া যতটা সহজ ঠাওরাও, তত সহজ নয়।

দাদা আবার বলিতে লাগিলেন,—তোমার ওপর অনেকটা বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু তুমি তেমনি শাস্তি দিয়েছ। বেশ, বড় হয়েছ, বুদ্ধি হয়েছে, যা' ভাল বুঝবে, তাই করো।

দাদা চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে মেজ দাদার কথা শুনিলাম। মেজদাদা বলিলেন,—খালি বখামি করবে, তা' পাশ হবে কেমন করে? এ'ত ছেলে-খেলা নয়! তুমি কড়া করে দুটো কথা বলতে পারলে না? দাদা গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—এত বড় ছেলেকে কি আর বল্‌বো! যার নিজের একটু আত্ম-সম্মান-জ্ঞান নেই, তাকে বলেই বা

ফল কি! মেজদা বলিলেন,—এবার হুগলীতেই পড়ুক, অমন ছেলেকে কলিকাতায় পাঠিয়ে আর বিশ্বাস নেই।

এত বড় কথা! একে ফেল হওয়ার অসহ্য দুঃখ, তাহাতে একবিন্দু সান্ত্বনা নাই, কেবল লাঞ্ছনা। আমি বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম, প্রবল ধিক্কার আসিয়া আমার সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করিল; আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ইতিমধ্যে বৌদি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—ছি ভাই ঠাকুরপো, কাঁদতে আছে কি? ফেল কে না হয়? ও সব অদৃষ্ট।

রুদ্ধস্বরে আমি কহিলাম,—না বৌদি, অদৃষ্টের কোন দোষ নেই! আমার নিজেরই সমস্ত দোষ।

বৌদি অঞ্চল দিয়া আমার অশ্রু মুছাইয়া কহিলেন,—তোমার দাদা বড় দুঃখ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, তুমি যে ফেল হবে, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। ও সব পাশ-ফেল হওয়া অদেষ্টে করে ভাই। তার জন্যে কাঁদে না। ছি! এ বছর হয় নি, আর বছর হবে।

আমি কহিলাম,—না বৌদি, দাদার কাছে কি বলে মুখ দেখাব! মেজদা কত গাল দিলেন।

বৌদি বলিলেন,—মেজ ঠাকুরপো রাগ করেছে, তার কারণ আছে। তোমাদের মেসের একটা ছেলে বড় দিনের সময় ওকে লিখেছিল যে, তুমি নাকি কোন্ উকিলের মেয়েকে বিয়ে করবে বলে ক্ষেপেছ। তার নামে পদ্য লেখ, সাবান-টাবান কত কি কিনে উপহার দাও, তাদের বাড়ী গান শুনতে যাও, পড়াশুনা কর না,—সেইজন্যেই ও-সব কথা বলেছে। সত্যি, এ রকম ঠাট্টা করা তার পক্ষে ভারি অন্যায় হয়েছিল।

বৌদিকে আমি মার মত ভালবাসি। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় মস্তক নত করিলাম; আমার মনে হইল, আজ বুঝি বিশ্বের লোক লাঞ্ছনার দণ্ড তুলিয়া আমাকে চূর্ণ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে!

রুদ্ধ স্বরে আমি কহিলাম,—বৌদি, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, এ বৎসর সব আমোদ-আহ্লাদ বিসর্জ্জন দেব, হুগলিতেই পড়ব। যদি পাশ হই, তবেই সকলের সঙ্গে মিশব, নাহলে—আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বৌদি কহিলেন,—এখন এসো, তোমাকে ডাকবার জন্য মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমার কথা তুমি কোন দিন অগ্রাহ্য কর নি—আমাকে তুমি চিরকাল ভালবাস,—আমার উপর কখনও রাগ কর না! এস লক্ষ্মী ভাইটী, এস, চান করবে এস।

বৌদির অমূল্য স্নেহে আমি তাঁর ক্রীতদাস—তাঁর স্নেহের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না।

সেই দিন রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে আমি শ্রীমতী কবিতা সুন্দরী ও শ্রীমান্ প্রেম-সুন্দরকে প্রণাম করিয়া কহিলাম,—দোহাই দেবী, দোহাই দেব! এ লাঞ্ছিত দীন দরিদ্রকে মুক্তি দাও। আমাকে লইয়া যথেষ্ট খেলা করিয়াছ! এখন অনুগ্রহ কর, মুক্তি দাও। তার পরদিন হইতে উভয়েই অন্তর্দ্ধান হইলেন!

তবে শ্রীমতী জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীমান কিন্তু বেলা দেবীর অঞ্চল ধরিয়া আসিয়া আবার আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন।

সতীশ কহিল,—আর লীলা ?

আমি কহিলাম,—আমার বিবাহের ছ' মাস পরে আমারই যত্নে ও আগ্রহে আমার একমাত্র শ্যালকসুন্দরের সঙ্গে তার পরিণয় সম্পাদিত হয়েছে। বাঙালীর মেয়ে ডেঁপোমির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, এ কথাটা কেউ বোধ হয় অস্বীকার করে না,—সেই ত লীলা, এখন শ্বশুর-বাড়ী গেলে তারই practical joke-এর চোটে আমাকে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে হয়!—হ্যাঁ, ভাল কথা হে! আজ এখানেই খেয়ে যাও। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি-টিচুড়ি হচ্ছে। শ্রীমতী বেলা নিজের হাতে সব তৈরী করছেন।

সতীশ কহিল,—চমৎকার বলেছ তো! সে খাসা হবে। মোদ্দা বেশ একটী romantic comedyর যোগাড় করে তুলেছিলে!'.

আমি হাসিয়া কহিলাম,—হ্যাঁ, তবে comedyটা কিছু farcical!

বোমায় বেকুবি

ছিলুম মিহিজামের সুন্দরপাহাড়ীতে শিবরাম বাবুর অতিথি হয়ে—সকালে-বিকালে প্রাণপণে বেড়ানো, দুপুরে আর রাত্রে নলিনীর গান শোনা,—দিনগুলো বেপরোয়া কেটে যাচ্ছিল। সেদিন সকালে চায়ের সঙ্গে মিহিজামের উৎকৃষ্ট জিলাপী ভোজন করছি, এমন সময় মধুপুর থেকে নিমন্ত্রণ-পত্র এসে হাজির! নলিনী গেয়ে উঠল,—যদুপতি, মধুপুর চলো।

ট্রেন বেলা আটটায়। চট্‌পট্‌ সব তৈয়ের হয়ে ষ্টেশনে ছুটলুম। ষ্টেশনের দক্ষিণে রূপনারাণপুরের বাঁক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রূপ ধরে পড়ে আছে—পাহাড়গুলো ওধারে দাঁড়িয়ে তাদের ভীমকান্তি রূপ নিয়ে। গিরিজা বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরালে, নলিনী টিকিট কিন্‌তে গেলো—১১১ নম্বরের, অর্থাৎ থার্ড ক্লাসের টিকিট। আমি প্লাটফর্ম্মে পায়চারি করতে লাগলুম।

যথাসময়ে টেন এসে হাজির হলে তিনজনে ইউরোপীয়ান ছাপ আঁটা একখানা থার্ডক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে উঠে বসলুম। সে-কামরায় একটা অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি লোক বসেছিল। মাথার চুল তার উস্কো-খুস্কো, পাৎলা লম্বা দাড়ি—সেগুলোর দিকে দাড়ির মালিকের মোটেই লক্ষ্য ছিল না—নেহাৎ বুনোভাবেই অযত্নের মধ্যে তার স্বাভাবিক গতিতে সে দাঁড়ি বেড়ে উঠেছিল। তার গতি রোধ করবার বা তাকে ছেঁটে-কেটে দেবার জন্য কোন দিন তার মালিক যে হাত উঠিয়েছিল, তা মনে হয় না। সংয়ের মত লোকটার মূর্ত্তি!

ট্রেনে চড়ে নলিনী গান ধরে দিলে,—আজ আমাদের ছুটী রে ভাই আজ আমাদের ছুটী!

গিরিজা তন্দ্রাস্তিমিত নেত্রে সে-গানের মাধুর্য্য উপভোগ করতে লাগল, আর আমি সেই লোকটাকে খুব সন্দিগ্ধভাবে লক্ষ্য করছিলুম।

লোকটার আকৃতি থেকে সন্দেহের কেমন একটা কালো ছায়াও ঘনিয়ে উঠছিল। এ-গানের দিকে তার হুঁস ছিল না। কামরায় গান চলেছে, এ ব্যাপারটা যেন সে বোঝেও নি! সে বাইরের পানে তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে, আর আমাদের উপর দিয়েও থেকে থেকে এক-একবার দৃষ্টির পশলা বুলিয়ে নিচ্ছিল। সঙ্গে তার একটা পুঁটুলি, ময়লা কাপড়ে বাঁধা। কখনো বা সেই পুঁটুলির গায়ে কাণ পাতছিল, যেন অত্যন্ত কঠিন রোগীর বুকের কাছে কাণ নিয়ে গিয়ে কোন নিপুণ ডাক্তার তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পরীক্ষা করছে,—এমনি অখণ্ড মনোযোগ নিয়ে, এমনি সন্তর্পণে!

ট্রেন জামতাড়া ছাড়িয়ে কর্ম্মাটারে পৌঁছল। লোকটা বরাবর ঠিক একই ভাবে বসে—একই ভঙ্গীতে। নড়া-চড়া তার রহিত, যেন মাটীর পুতুল।

ট্রেন কর্ম্মাটার ছাড়ালে লোকটা ঘুমে ঢুলে পড়ল।

আমি তখন চঞ্চল হয়ে উঠলুম—কর্ম্মাটার আর মধুপুরের মাঝখানে মদনকোটার কাছে পাঞ্জাব মেল সেদিন যে তিন-তলার সমান উঁচু লাইন ছেড়ে একেবারে মাঠের গভীর গহ্বরে ঝরে পড়েচে, তাই দেখবার জন্যে!

ট্রেন চলেছে মৃদুমন্দ গমনে—সামনে অবারিত মাঠ পড়ে আছে, দিগন্ত-রেখার তট ঘেঁসে, অঙ্গে তার সবুজের ঢেউ খেলে

যাচ্ছে। স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশ মাথার উপর তার বিরাট স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাই দেখচি। মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ট্রেন ক্রমে জয়ন্তীর পুলে উঠল। উপরে একটা ঘড় ঘড় শব্দ সুরু হলো, আর নীচে, বহু নীচে কোথায় কোন্ পাতাল-পুরীর বুকে বালির বিপুল বিস্তার—তারি গা চিরে চিরে জলের সরু ধারা কোথাও বয়ে চলেছে,—কোথাও বা বদ্ধ জল। এত নীচু যে চেয়ে দেখতে গেলে চোখ ঠিকরে যায়! আকাশে বকের পাঁতি উড়ে চলেছে—ধানের ক্ষেতে কোথাও বা তারা বসছে। ট্রেন ক্রমে মদনকোটা পেরুল। তার পরেই লাইনের পশ্চিম দিকে গাড়ীর চাকা, ভাঙা এঞ্জিন—

আমার শরীর শিউরে উঠল। উঃ, কি প্রকাণ্ড হত্যাশালা এখানে গড়ে উঠেছিল সেদিন সেই গভীর রাত্রে! আমার গা ছম্ ছম্ করছিল—ফিরে বন্ধুদের বললুম—এখনো ভাঙ্গা গাড়ী পড়ে আছে হে!

কিন্তু কে শোনে, সে কথা! গায়ক আর শ্রোতা দুজনে তখনো গানের সুরে, সুরের নেশায় বিভোর মশগুল! নলিনী তখন গাইছে,—

মেঘের কোলে কোলে
যায়রে চলে বকের পাঁতি!

তখনি আবার সেই উদ্‌ভুট্টে যাত্রীটির পানে আমার ন পড়ল। সে বেশ ঘুমুচ্ছে, তার সেই পুঁটলিটির উপর একখানি হাত রেখে। পুঁটুলির মধ্য থেকে একটা বাদামী কাগজের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। আমার ভারী কৌতূহল হলো, কি চীজ যে ও এত-যত্নে ওটাকে আঁকড়ে রয়েচে। নিশ্চয় চোরাই মাল! কিছু চুরি

করে দেশে পালাচ্চে। কিন্তু না—দেশ কি—এ ত দেখছি, বাঙালী! তবে?

অন্যায় কৌতূহল, সন্দেহ নাই—তবু সে কৌতূহল দমন করতে পারলুম না। আস্তে আস্তে উঁকি দিয়ে তার তল্পী পরীক্ষায় অগ্রসর হলুম। একটু ঝুঁকতেই শুনি, পুঁটলির মধ্য থেকে একটা কি আওয়াজ হচ্ছে! কি কল চল্‌ছে যেন!

ফস্‌ করে মনে হলো—তাইত, মধুপুরের সামনে ট্রেন ডি-রেল করবার জন্যে ষ্ট্রাইকাররা চেষ্টা করেছিল, এ তাদেরই একজন নয় তো! হয়তো আর কোথাও আর-কোন বড় রকমের বিপদ বাধাবার জন্যে অগ্রসর হয়ে চলেছে! ওর পুঁটলিতে বোমা নয় তো?

গা ছম্‌-ছম্‌ করে উঠল। মদনকোটার ঐ শ্যাম-প্রান্তরে অমনি আহত নরনারীদের রক্তাক্ত মুখগুলোর স্মৃতি আমার মনের মধ্যে তার দারুণ লোমহর্ষণ ছবি ফুটিয়ে জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হীরোর রূপে সারা দেশের সাম্‌নে ফুটে ওঠবার একটা দুর্দ্দমনীয় লোভও জন্মালো। এই লোভ আমায় মুহূর্ত্তের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললে—আমি যেন জ্ঞান হারালুম!

তারপর কখন্‌ যে নিমেষের মধ্যে আমি তার হাতের গ্রাস থেকে সেই পুঁটুলিটা ছিনিয়ে নিলুম,—সেটা হাতে ভারী ঠেকেছিল,—আর সে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে দাঁড়িয়ে উঠে আমায় সিংহের মত বিক্রমে আক্রমণ করলে, আমি তার সে আক্রমণ ব্যর্থ করে পুঁটলিটা ছুড়ে বাইরে ফেলে দিলুম—কিছুই তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ জ্ঞান হলে দেখলুম, গিরিজা আর নলিনী দুজনে আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর সে লোকটা পাগলের মত কখনো মাথা

চাপড়াচ্ছে, কখনো বসে পড়ছে, কখনো বা দাঁড়িয়ে উঠে রুক্ষস্বরে আমায় গাল দিচ্ছে ! আমি ত হতভম্ব।

হঠাৎ লোকটা বিড়-বিড় করে কি বকে ট্রেনের এ্যালার্ম সিগ্‌নাল টেনে দিলে—মুহূর্ত্তের মধ্যে ট্রেনখানা খট্ করে থেমে গেল। তারপর বিপুল গণ্ডগোল বাধলো। গার্ড, ড্রাইভার, যাত্রী—সদলে ছুটে এল এবং সেই বিপর্য্যয় গণ্ডগোল থেকে আসল ব্যাপার বোঝা গেল, লোকটা ঘড়িওয়ালা—মধুপুরে কোন্ রাজা বাড়ী তৈরী করাচ্ছেন, তাঁর বাড়ীর টাওয়ারে একটা ঘড়ির জন্মে অর্ডার দেন কলকাতায়। লোকটা সেই ঘড়ি দস্তুরমত রেগুলেট করে সযত্নে নিয়ে আসছিল মধুপুরে, সেটাকে টাওয়ারে বসাবার জন্মে। আমি তার সেই ঘড়িই ছুড়ে ফেলে দিয়েছি !

আমার কৈফিয়ৎ তলব হলো। আমি বললুম, মদনকোটার সেই কাণ্ডের চিহ্ন দেখে আমার মাথা কেমন বিগড়ে গেছল, আমি ভেবেছিলুম, লোকটা ষ্ট্রাইকার, আর তার তল্পীতে বোমা ! তাই সেটা ফেলে দিয়েছি।

দু'চারজন কুলি গিয়ে ঘড়িটা তুলে আনলে। আচ্ছা জান্‌তার ! প্যাকেট খুলে দেখা গেল, ঘড়িটা দিব্যি চলছে—কোনোখানে জখম হয়নি !

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হলো না—জের গড়াল আদালত পর্য্যন্ত। সেখানে লড়ালড়ি করার পর হাকিম আমায় ছেড়ে দিলেন—mistake of facts বলে।

পশ্চিম-যাত্রাটা সেবার খুব দীর্ঘ হয়েছিল—এখন তিন বছর আর ওধারে পা বাড়াব না, স্থির করে রেখেছি।